ইতিমধ্যে জোরে কথা বলার ভাবটা কমিয়া আসিতেছিল। বলিলাম — তবে তুমি বল আর কখনও এইসব করিবে না। সে তাহা স্বীকার করিল। পরে তাহাকে, কিরূপে পূজা করিবে, কিভাবে কর্মাদি করিলে সিদ্ধিলাভ হয় বলিলাম। যে যে পদ্ধতি তাহাকে বলিলাম, এ শরীর কখনও সেইরূপ অনুষ্ঠানাদি করে নাই, আর কাহাকেও করিতে দেখে নাই। আপনা হইতে ঐ সব মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে বেশ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

সাধকের একটি অবস্থা আসে, যে সময় তাহারা যাহা দেখে তাহাই বলে। তাহাদের গোপন করিবার ভাবই থাকে না। সাধকের ভাব গ্রন্থিটি খুলিয়া গেলে তাহার লক্ষণ বড়ই সুন্দর হয়। সর্বক্ষণ ভাব বিহ্বলতা, যুগপৎ রুক্ষতা ও কোমলতা এবং নানা অলৌকিকতা তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। রুক্ষই হউক আর কোমলই হউক যে ভাবে সাধারণের প্রাণ গলিয়া যায় সেই আসল ভাব। ইহার যে কোন একটি কৃপা প্রার্থীদের লোভনীয় সামগ্রী। এই অবস্থায় সাধকের ধীরে ধীরে ভবিষ্যত ও বর্তমানের সম্পূর্ণ থলিটি ছিঁড়িয়া যায়। তাই সাময়িক রূক্ষ ও কোমলতার চূড়ান্ত দেখা যায়। কিন্তু ব্যবহারে ভেজাল থাকিলে যুগপৎ ভাবের প্রকাশ হয় না।

শোকাতুর মানুষের যেমন বে-খেয়ালের ভিতরও পরণের কাপড়টির প্রতি খেয়াল থাকেই, বাহ্য প্রস্রাবও স্বাভাবিক চলে, সেইরূপ সাধকের শারীরিক ব্যবহারের নানা খোলা ভাব প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভিতরেও এক স্থির ধারা থাকিয়া যায়, তবে সকল ভাব অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়।

আশুর উপনয়ন ও ভোলানাথের মানসিক কালীপূজা

ইহার মধ্যে আশুর পৈতা হইল। এ শরীর একা ও বাক্ বন্ধ। সব কাজই যেন কলের পুতুলের মত ভাল মতে, শিষ্টাচার সহ হইয়া গেল। এ শরীরের সব গোছান কাজকর্ম দেখিয়া অনেকে অবাক হইত এবং খুব বিশুদ্ধভাবে চলিত বলিয়া ভোলানাথ ও অন্যান্য কেহ কেহ বলিত — শুচিবাই হইয়াছে।

আশুর পৈতার সঙ্গে ভোলানাথের দুই মানসিক কালীপূজা হইল। এই উপলক্ষ্যে কাজ কর্মাদি সব এক হাতে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে করা

হইয়াছিল। ১০।১২ দিন পূর্ব হইতে একখানি ঘর আপন হাতে লেপিয়া, চাল, বেড়া ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া, ভোগের জিনিষ ইত্যাদিতে গোবর জলের ছিটা দিয়া এবং পূজার সব জিনিষাদি এমনকি ভোগের মসলাদি পর্যন্ত ভাল করিয়া ঝাড়িয়া, বাছিয়া ধুইয়া লেপা জায়গায় দিনে দিনে রৌদ্রে শুকাইয়া ঐ ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলাম। স্নান করিয়া অভুক্ত অবস্থায় এ সকল করা হইয়াছিল। যেদিন পূজা হইল সেদিন পূজা না হওয়া পর্যন্ত লেপা ধোওয়া জায়গা ছাড়া আর কোথাও যাওয়া হয় নাই। ধোওয়া জিনিষ ছাড়া ছোঁওয়াও হয় নাই। পূজার এইরূপ পবিত্র ও সুন্দর আয়োজনাদি দেখিয়া পুরোহিতের বড় আনন্দ হইয়াছিল।

চরকায় সূতাকাটা

কয়েকমাস যাইতেছে, সে সময় চরকায় সূতাকাটার খুব ধূম ঘরে ঘরে। ভোলানাথ বলিল — সকলে চরকা নিতেছে। আমি একটি আনিব নাকি? এখন ত তুমি অনেক সময় পাও। বলিলাম — আচ্ছা। চরকা আসিল। চরকা শিখাইবার একটি লোক ছিল, তাহাকে ছয় আনা দিতে হয়। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে নিয়া আসিব কিনা। বলিলাম যদি সূতা কাটিতে না পারি তবে তাহাকে ডাকিব। নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম। সূতা কাটিবার সময় চরকায় গুণ গুণ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতাম যে, কণ্ঠে সে বীজটি তাহার স্বাভাবিক ধারায় চলিতেছে। এইরূপে কিছু সূতা কাটা হইল। ভোলানাথ অন্যান্যের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিল সূতা খুব ভাল ও সরু হইয়াছে; তাহা দিয়া এক জোড়া কাপড় তৈয়ারী করা হইল।

ইহার মধ্যে জানকীবাবুর ভগিনী আসিল, দেখিলাম সে চরকার সূতা দিয়া গামছা বানাইয়াছে। এ শরীরও বানাইবে বলিলে সে জানাইল যে উহার সরঞ্জাম তাহার সঙ্গে আনে নাই। তাহাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলাম কি কি লাগিবে তাহা শুনিয়া সেই সব বানাইয়া নিলাম। নিজেই গামছা তৈয়ার করিয়া লইলাম। পরে ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূতা, চরকা কোথায় চলিয়া গেল, খেয়ালও নাই।

বাজিতপুরে উষাদিদি ও জানকীবাবু

উষাদিদির স্বামী বদলী হইয়া বাজিতপুর আসিল। কয়েকমাস পরে উষাদিদিও আসিল এবং পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া খুব আনন্দ পাইল। আমাদের পাশের বাসায়ই থাকে। আমরা ঘরের ভিতর বসিয়াই কথাবার্তা কহিতে পারিতাম।

ঘর, বিছানা, জিনিষপত্র সবই পরিষ্কার রাখিতাম। নিজহাতে সাবান দিয়া কাপড় ধুইতাম। এ শরীরের এক মামাত ভাই* (শ্রীনিশিকান্ত স্মৃতিভূষণ) আমাদের সঙ্গে থাকিত। আমাদের বিছানায় কাপড় ইত্যাদি ধোপায় ধোয়ার মত পরিষ্কার দেখিয়া উষাদিদি কখনো কখনো তাহার কোলের শিশুকে বিছানায় বসাইয়া দিত আর হাসিত। একদিন সেটি বিছানায় প্রস্রাব করিল। নিজেই সব ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। আমি খুব হাসিতেছি দেখিয়া বলিল — তোমার ত হাসি, আর আমি নিজের দোষে খাটিতেছি। বলিলাম — জীবের ধর্মই এই, নিজে কর্ম তৈয়ারী করিয়া আবার নিজেই খাটিয়া দুঃখ পায়। তাহার ব্যবহারিক সরলতা ও বুদ্ধি বেশ ছিল।

একদিন কোথায় পূজা হইল, কে আসিয়া দুইখানি নৈবেদ্য আমাদের দুইজনকে দিয়া গেল। উষাদি প্রসাদ তাহার মেয়েদের দিল ও নিজেও নিল, বাকিটা ঘরে তাহার স্বামীর জন্য রাখিয়া দিল। আমাদেরটা আমি রাখিয়া দিতে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নিলে না? বলিলাম — ভোলানাথ আসুক, আগে খাইতে নাই। উষাদিদি বলিল, আজ হইতে আমিও আগে খাইব না। সে সর্বদা আমার কাছে আসিয়া কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিত। কাপড় ধোয়া, সংসারের কাজকর্ম ইত্যাদি। অথচ আমি যে কিছু জানিতাম ইহার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। যখন যাহা দরকার আপনা হইতে হইয়া যাইত।

একদিন নিকটে এক বাড়ীতে কীর্তন হইতেছে, উষাদিদি বলিল, চল ঐ বেড়ার কাছে বসিয়া কীর্তন শুনি। আমরা গেলাম। সেখান

* নিশিকান্ত স্মৃতিভূষণ মা'র আপন মামাতো ভাই। ইনি বাজিতপুরে কিছুকাল ভোলানাথের সঙ্গে ছিলেন। বয়সে তিনি মা'র বড় ছিলেন।

হইতে আসিয়া আমি মামাতো ভাইকে পরিবেশন করিতেছি দেখি আমার হাত পা ঠাণ্ডা, শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, ভাতের থালা হাত হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহা ধরিতে যাওয়া হয় হাত হইতে গড়াইয়া পড়ে। শরীর যেন অবশ। কোন মতে টানিতে টানিতে অন্য ঘরে গিয়া মাটিতে গড়াগড়ি হইয়া শরীরটা কেমন হইয়া একধারে পড়িয়া রহিল। মামাত ভাই কি উষাদিদি এ শরীরের পূর্বের অবস্থাদি সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। অনেকক্ষণ পর মাটি হইতে উঠিলাম। পরদিন উষাদিদি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম — মাঝে মাঝে এই রকম হয়।

ঢাকাতে দুই বোনের বিবাহ

এ শরীরের দুই বোনের বিবাহ ঢাকাতে হইয়াছিল। সে উপলক্ষ্যে আমরা ঢাকাতে যাই। বিবাহের সময় বড়টির বর দেখিয়া, মা'র কাছে বিশেষ করিয়া বলিলাম এ বর উপযুক্ত নয়। মা ও অন্যান্য সকলে বুঝাইল যে শুভকর্মের সময় এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে নাই। বলিলাম — কি করিব যাহা দেখিতেছি তাহাই ত বলি। এ শরীরে যখন যে দিকটা খেয়াল তখনই তাহা পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় ত। মা হাসিতেছেন আর বলেন — বর দেখিতে আমার ত মন্দ লাগে না। তুই কেন এই রকম বলিতেছিস? বিবাহ হইল। ঘটনাচক্রে এ শরীর দ্বারা লৌকিক আশীর্বাদ ইত্যাদি হইল না। শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময় সুরবালা নমস্কার করিতে আসিল। আমার মুখ হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল — তুমি আর বেশী দিন সংসারে থাকিও না। পরে জানা গেল স্বামীর মাথা খুব ঠিক ছিল না। বিবাহের প্রায় ৩ বছর পরে সুরবালা মারা গেল।

বিবাহের পরই ছোটবোন ও তাহার জামাইকে নিয়া আমরা অনেকজন ঢাকায় ঢাকেশ্বরী বাড়ীতে যাই। ঢাকেশ্বরী বাড়ীতে নমস্কার করিতে করিতে এই শরীরের ভাব কিছু সময়ের জন্য অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম আপনা হইতে আসন হইল, তাহার পর নানা প্রকারের নমস্কার হইল। পরে ধীরে ধীরে স্থির হইয়া বসিল। এইসব সকলেই বিশেষ লক্ষ্য করিতেছিল। দেবালয়ে

এই প্রথম এ অবস্থার প্রকাশ হইল। ক্রমশঃ কোন ঈশ্বরীয় ভাব দর্শনে, শ্রবণে ও স্মরণে শরীরের অবস্থা পরিবর্তন হইয়া যাইত।

সাধু শিবানন্দ

বাজিতপুরে গিয়া সুবিধা পাইলে আগের মত রাত্রিতে বসিতাম কোন কোন সময় দেখিতাম আমার যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ইহার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কখনো চলাফিরা করিতেও এ রকম হইয়া যাইত। ভোলানাথকে ইহা জানাইলাম।

ঐখানে (বাজিতপুরে) সব্‌রেজিস্ট্রারের বাড়ীতে এক সাধু আসিয়াছিল, নাম শিবানন্দ। সে আমার অবস্থাদি শুনিয়া আমাদের বাসায় একদিন রাত্রে আসিল। আমি স্থির হইয়া আসন করিয়া বসিলাম শরীরের আলোড়ন ক্রিয়াদি সামান্য হইল। সে দেখিয়া চলিয়া গেল। পরে তাহার অনুরোধে ভোলানাথ ও আমি সব্-রেজিস্ট্রারের বাসায় একদিন গেলাম। সাধু যেখানে পূজা করে সেখানে একটি আসন দিল। আমি বসিলাম। সাধারণতঃ ঘরে রাত্রে বসিলে শরীরের ক্রিয়াদি কতক্ষণ হইয়া ধীরে ধীরে শরীর স্থির হইয়া যাইত, ঠিক সেইরূপ হইল। মহা আনন্দের স্রোত ভিতরে বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। শরীর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

একদিন ভোলানাথ বলিল ঐ সাধু আমাদের বাসায় শিবপূজা করিতে চায়। আমি বলিলাম আচ্ছা। একদিন পূজা ও তাহার খাওয়াদির ব্যবস্থা করা হইল। ঐ সাধু আসিয়া পূজা শেষ করিয়া আমাকে ডাকিল। সে চৌকির উপর বসিয়া বলিল — আপনি আমার এই শিবের উপর পূজা করুন। ভোলানাথের আদেশে পূর্বেও তাহার সহিত বেশী ঘোমটা টানিয়া কথাবার্তা বলিয়াছি। বলিলাম — কোনদিন ত শিবপূজা করি নাই। সে বলিল — আপনি পূজায় বসুন আমি বলিয়া দিব। ইহার ভিতরই আমার শরীরের ভাবান্তর হইতেছিল। তখন আসনে বসিলে আমার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সাধু বলিয়া উঠিল — আপনি আর কিছু করিবেন না, কেবল ফুল-চন্দন বেলপাতা শিবের মাথায় দিন। আচমন করিতে গেলে হাত এলো-মেলো হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, হাত আর উঠে না। সে

আমার অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া ব্যস্তসহকারে বলিল — থাক থাক আর প্রয়োজন নাই কিছু করিতে হইবে না। সে খাওয়া দাওয়া করিয়া নিজের শিব নিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল। সেই সাধু নাকি কাহাকে কাহাকে বলিয়াছিল এ শরীরের উপর আনন্দ ভৈরবীর দৃষ্টি আছে।

হরিনামে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ

এ শরীর একাদিক্রমে মাটিতে প্রায় মাসখানেক ধরিয়া সমানভাবে রাত্রিতে বসিতেছে। শরীরে নানাবিধ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিলাম বসিবার পর মুখে ঐ হরিনামের ধ্বনির সহিত পূরকে 'হরি' রেচকে 'বোল' হইতে হইতে কোন একটি বিশেষ আসন হইয়া দুলিতে দুলিতে চারিদিক ঘোরা আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে আবার স্থির হইয়া যাইতাম। শরীর নিশ্চল, পাথরের মত স্থির, ভাব সম্পূর্ণ সাম্য। চোখের দৃষ্টি দূরে স্থিত — যেন কি এক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। দেখিতাম শ্বাস বন্ধ হইয়া কুম্ভকের মত হইত। কিন্তু তখন প্রাণবায়ুর ক্রিয়াদি বা রেচক, পূরক, কুম্ভকাদি কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে কাহোরো নিকট শুনা ছিল না। কখনো কখনো আপনা হইতে পা লম্বা হইয়া যাইত, ক্রমে ক্রমে আবার হাত স্পর্শ না করিয়া গুটাইয়া পদ্মাসন, বা অন্য আসন হইত। সময় সময় আবার পা মেলিয়া যাইত এবং এক এক হাত এক এক পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর রাখা হইত। আর মাথা ও বাকি শরীর আপন উরুর উপর দিয়া পড়িয়া থাকিত। আবার কোন দিন গোমুখী আসন ও নানা রকমে দিনে দিনে কত কত অনেক রকমে রকমে আসন হইয়া সামনের দিকে মাথা মাটিতে পড়িত। হাত দুইখানি শরীরের সঙ্গে মিলিয়া পিছনের দিকে যাইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিত। যখনই যে কোন প্রকার আসন হইত উহাতে হাতের কোন সাহায্য লইতে হইত না। পেট, বুক ও মাথা আসনে স্থিত অবস্থায়ই মাটির উপর পড়িয়া থাকিত। এ আসন অবস্থায় মাথা ও এক গাল মাটিতে স্পর্শ রাখিয়াই এই ক্রিয়া হইত। আবার ঘুরিয়া আর এক গাল মাটিতে, আবার কপাল হইতে নাক মুখ থুতনী মাটিতে, হাত দুইখানি কখনো পিছনের দিকে মাটিতে রাখিয়া

এবং উর্ধ্বে গিয়াও মাটিতে সটান থাকিত। এই রকম নানা প্রকার ক্রিয়াদি ও প্রণামাদি হইত। পরে উঠিয়া ঠিক হইয়া যাইত। কিন্তু প্রত্যেক আসনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের গতি পরিবর্তিত হইত এবং রেচক, পূরক ও কুম্ভক সব আসনের সঙ্গে সঙ্গে যখন যেখানে যত সময় দরকার ঠিক যেন কলের মত হইতে থাকিত। শুধু শ্বাসের বিবিধ গতির খেলাই শরীরটার নড়াচড়ার দ্বারা প্রকাশ হইত। পড়িয়া থাকিবার সময় দেখিতাম এ শরীরটা ক্রিয়াদি চলিতে চলিতে হঠাৎ চুপ হইয়া যাইত। আবার কি হইত — শরীরটা প্রথম প্রথম অপেক্ষা করিয়া থাকিত। কোথায় থাকিয়া কিভাবে কাহাকে কে দেখিতেছে, এইসব কি হইতেছে, পরেও বা কি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে এইসব বিচার রূপে প্রকাশ হইত। শরীর একেবারে চুপ হইলে তখন কিছুক্ষণ বসিয়া পরে শুইয়া পড়িত। প্রাতে উঠিলে শরীর হাল্কা এবং পা হইতে মাথা পর্যন্ত একটি আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে এইরূপ বোধ হইত। দিন রাত্রি সে আনন্দে ভরপুর প্রকাশ থাকিত। বাসায় একা, গৃহের কাজ তাড়াতাড়ি করিতাম। কতক্ষণে রাত্রি আসিবে আর আমি আপন ভাবে গিয়া বসিব ইহা শরীরটায় যেন লোভের মত প্রকাশ হইত। যতই এক এক দিন এক এক রকম আসন ও শরীরের নানা রকম ক্রিয়া হইতে লাগিল, ততই সে আনন্দ ও উৎসাহে শুইবার ও খাইবার ভাব ওই সময় চলিয়া সেইগুলি বে-খেয়ালের মত প্রকাশ পাইতে লাগিল। যদিও ভোলানাথ এ শরীরের এইসব কার্যে কখনও বাধা দেয় নাই তথাপি এসব দেখিয়া, দীক্ষা হয় নাই, অথচ এই সব কি হইতেছে, ইহা ভাবিত ও বলিত। এই শরীর ইহা শুনিয়া হাসিত।

দীক্ষার খেলায় মা

বাজিতপুর আসিয়া কিছুদিন পরই পুকুরের উত্তর পাড়ে বসিয়া এই শরীরের একটা খেয়াল আসিল — ভগবানকে মানুষ কি রকম করিয়া চায় ও পাওয়া যায়। সেই সাধনার খেলাটা খেলিতে হইবে। একদিন দীক্ষা কি, কেমন করিয়া হয় ইত্যাদি নানা বিষয় বিশেষভাবে খেয়ালরূপে প্রকাশ হইল।

দীক্ষার ব্যাপার সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন — যতটুকু হইয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে আশুর মা'র নিকট তাহার গুরুদেব এক

পত্র দিয়াছিলেন। সে পত্রখানি ছিল। সে সময় বয়স খুব কম। সেই চিঠি হইতে তাঁহার ঠিকানা বাহির করিয়া ভোলানাথ তাঁহাকে পত্র দিলেন আসিবার জন্য। কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আশুর মার কাছেও ঠিকানা চাওয়া হইল, কোন জবাব আসিল না। এইদিকে দীক্ষা সম্বন্ধীয় যে কথাটা খেয়ালে আসিতেছিল, সেই খেলাটা আরম্ভ হইল। কেননা এই শরীরের ত সব দিকেই চূড়ান্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আরও খেয়াল হইল দীক্ষার জন্য ব্যাকুলতায় ভগবান স্বয়ং দীক্ষারূপে প্রকাশ পান। যেমন গাছের মধ্যে বীজ নিহিত থাকে ও বীজের মধ্যে গাছ নিহিত থাকে তদ্রূপ গাছ হইতেও বীজের প্রমাণ, বীজ হইতেও গাছের প্রমাণ — স্বাভাবিক প্রকাশ।

সেদিন ঝুলন পূর্ণিমা। সন্ধ্যায় পাড়ার একটি বউ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঝুলন দেখিতে যাইব কিনা। আমি 'না' বলিয়া দিলাম। ভোলানাথ খাইবার পর আমি তাড়াতাড়ি সামান্য কিছু খাইয়া তাহার চৌকির একটু দূরে মাটিতে বসিয়া বলিলাম — দেখ আমার শরীরটা আজ যেন বিশেষভাবে কেমন লাগিতেছে। আমি আজ এখনই বসিব। অন্যান্য দিন এত সকালে খাই না। সেদিন সামান্যই খাওয়া হইল। আজ যেন কেমনই একটা ভাব। ইহার দুইচার দিন পূর্বে একদিন ভোলানাথ আমার এইরূপ নানা ভাব দেখিয়া চিন্তা সহকারে বলিয়াছিল — দেখ, তোমার দীক্ষা হয় নাই অথচ এইসব কি হয় আমি ত বুঝিনা। আমরা শৈব ও শাক্ত অথচ তুমি হরিনাম কর, আর এইরূপ অলৌকিক অবস্থাদি পর পর হয়। আমাদের ঐ মতেও ত নাম করিয়া দেখিতে পার। বলিলাম — আচ্ছা। সেই হিসাবে আমি নিজেই "জয় শিব শঙ্কর ব্যোম ব্যোম হর হর" ভিতরে ঠিক করিলাম এবং ভোলানাথকে ইহা বলিলাম — তাহা হইলে আমি কি এই নাম করিব? ভোলানাথ বলিল বেশ ত কর।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, দেখি কি পূর্বে হরিনাম করিতে বসিলে শরীরের উপর দিয়া যে ক্রিয়াদি বিশেষ করিয়া হইত, তাহাই এই নাম করিতে করিতেও আরও বেশী এবং ক্রমশঃ পরিবর্তিত ভাবে সেই সব ক্রিয়াদি হইতেছিল, সেইভাবে পরিবর্তন হইতে হইতে নূতনভাবে বাড়িয়াই চলিল। স্থির ভাবে একটু উত্তর পূর্ব কোণাভিমুখী হইয়া একটি বিশেষ আসন করিয়া শরীরটি বসিয়া গেল। মাটিতে ঘর লেপার

মত লেপিয়া একটি যজ্ঞ-মণ্ডল আপনা হইতেই তৈয়ারী হইল এবং আসনস্থিত অবস্থায় শরীরটা সামনের দিকে মাটিতে পড়িয়া রহিল। তখন রাত্রি আন্দাজ দশটা এগারটা বাজিতে চলিল। পূর্বে যজ্ঞমণ্ডল তৈয়ারী করিতে কোনদিন দেখা হয় নাই। সেদিন ত আপনা হইতে যজ্ঞমণ্ডল তৈয়ারী হইল। ঐ আসন অবস্থাতেই উঠিয়া পূর্ব দিকে মুখ করিয়া বসা হইল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নূতন পরিবর্তনের ধারায় কি এক সুন্দর অপূর্ব ভাবে ভাবিত। ভিতর হইতে নাভিমূলে সাড়া দিয়া একটি বীজ জাতীয় মন্ত্র উঠিতেছিল। আসন যেভাবে যখন সেখানে, সে সময় পূজা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। হাত ঘুরিয়া যাইয়া ঐ মণ্ডপের মাঝখানে যন্ত্রের উপর অক্ষর অঙ্কিত হওয়া, অগ্নিমূর্ত প্রকাশ, যজ্ঞের ও আহুতির উপচারাদি সহ আপনা হইতেই আপনাতে প্রকাশ হইয়াছিল ত। স্থূল ও মানসপূজা ও যজ্ঞাদি আহুতি যে ভাবে হয় সেইরূপ প্রকাশও হইয়াছিল। মন্ত্রাদি ও দ্রব্যাদি সহ স্থূল প্রকাশিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের শরীরের অঙ্গাদি যেখানে যে রকম দরকার ইহার সঙ্গে সহায়তা করিল। মন্ত্রের দ্বারা পূজা, দ্রব্যের দ্বারা পূজা কেমন সুন্দর এইগুলির প্রকাশ। এই সব হইতে হইতে আবার শরীরটা চুপ হইয়া গেল। আর ভিতরে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই অক্ষরের ধ্বনি অস্পষ্টই উঠিতে আরম্ভ করিল। নাভির নীচের দিক পর্যন্ত যেন সেই ধ্বনি সাড়া দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। অস্পষ্টতা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে হইতে এই শরীরটার চোখ সাময়িক বুজিয়া গিয়াছিল। মুখ ও জিহ্বার নানা রূপ আঁকাবাঁকা ক্রিয়া হইয়া নাভি হইতে সর্ব শরীরের ভিতরে বাহিরে জোর লাগিয়া নূতন একভাবে সেই অক্ষরটি বেগের সহিত আসিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে ও মুখে উচ্চারিত হইয়া গেল। পরে মন্ত্রটি স্থণ্ডিলে অঙ্কিত হইয়া মন্ত্রদ্বারাই আহুতি ইত্যাদি সমাপ্ত হইয়া গেল।

যোগশাস্ত্রে যে ষট্‌চক্রভেদের কথা আছে এইটি তাহারই বিশেষ একদিকের প্রকাশ ত। সর্বাঙ্গের জড়তা বাহিরে ভিতরে না ভাঙ্গিলে নামের ঝঙ্কার ও বীজাদির উচ্চারণ, স্মরণ বা চিন্তা ঠিকমত চলিতে পারে না কিন্তু।

ঐ আহুতি হইয়া গেলে পর তখন শরীরের গতি এক অভিনব উৎসাহ ও স্ফূর্তিতে শিহরিয়া উঠিল। এই শরীরের গতি এক মহা আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া চুপ হইয়া গেল। ঐ অক্ষর কি?

এইরূপ জিজ্ঞাসা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অর্থ ও রূপ গুণাদি সহ এবং পরে পর পর যে সকল মূর্ত ও অমূর্ত ভাবাদি প্রকাশ হইবে এই শরীরের ভিতর আভাস প্রকাশ হইল এবং নিজের ভিতর হইতে কানে শব্দরূপেও ধ্বনিত হইল। বসিয়া আছি, দেখিলাম হাতের করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যাইতেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উহা এধার ওধার ঘুরিয়া যথাস্থানে আসিল এবং ঐ মন্ত্র জপ হইতে লাগিল। সেই রাত্রেই প্রথম এই শরীরের ভিতর দিয়া এমনভাবে মন্ত্র, জপ, পূজা ও যজ্ঞাদি যাহা কিছু প্রাকাশ পাইল। পরদিন প্রাতে সর্ব শরীরের এমনকি পেটের নাড়ীতে ও শিরায় শিরায় একটু একটু সাড়া ছিল এবং ক্রিয়ার গতিতে ধীরে ধীরে কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

ভোলানাথ গত রাত্রিতে এ শরীরের দুই একটি ক্রিয়া দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আজ জিজ্ঞাসা করিল — কাল যেন তোমাকে কি কি করিতে দেখিলাম? তাহাকে হঠাৎ বলিলাম — আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিও না। তোমার কাছে এ যাবৎ কোন কথা গোপন করি নাই। কিন্তু কি করিব বলিবার ভাব হইতেছে না। তুমি যদি বল, দেখা যাক, যদি বলা হয়। কিন্তু যদি বলা হয়, তবে পরে এ শরীরের কি হইবে তাহা বলা আসিতেছে না। তখন বলিয়া উঠিল — আমিও জানিতে পারিব না? আচ্ছা! দেখিলাম অবাক হইয়া যেন একটু চিন্তিত হইল। বোধহয় বলিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে ইহা ভাবিয়া বলিল — আচ্ছা! বলিও না।

সেইদিন সকালেও একটু এইসব নিয়া বসা হইয়াছিল। বাড়ীর সকলে খাওয়ার পর স্নান করিয়া না খাইয়া, লোকের দীক্ষা হইলে যেমন সন্ধ্যা করে সেইরূপ ভাবে শরীরটা যাইয়া বসিল। দিনে এই ধরণে প্রথম বসা। কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম পরে জপ আরম্ভ করিতেই দেখি হাত গুটাইয়া আসে। শূন্যভাব নিয়া শরীরটা বসিয়া আছে। কেননা সন্ধ্যার ক্রিয়া শেষ করিতেই হইবে এই ভাব। অনেক পরে দেখি পূর্ব রাত্রে যেমন সাধারণ আসনে বসিলে মেরুদণ্ড বরাবর কোমরের কিছু নীচে টক্ টক্ শব্দাদি ও শ্বাসের ক্রিয়াদি হইয়াছিল সেইরূপ হইল এবং একটা বিশেষ আসনে বসিয়া গেলাম। বসিবার পর আপনা হইতেই ঐরূপ ক্রিয়াদি হইতে লাগিল। যেমন আসনের বামপাশে জলের ছিটা দিয়া পূজার স্থানটি লেপা, সেইরূপ বামপাশে জল, আমি বাম হাত দিয়া ডান হাতে জল ঢালিয়া পূজার

জায়গা করিলাম, পরে একটি বাসনে ভাল করিয়া হাত ধুইলাম। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, নৈবেদ্য করা, ধূপ দীপ জ্বালান ইত্যাদি সব আয়োজন করিলাম। এই সবই স্থিরভাবে সিদ্ধাসনে বসা অবস্থাতেই প্রকাশিত হইল। সবকিছু নিজের ভিতর হইতেই নিজের কাছে প্রকাশ। শেষে যেখানে বসিয়াছি সেইখানে হাত দুইখানি মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরীরের প্রায় প্রত্যেক অঙ্গ স্পর্শ করিয়া মাটিতে পড়িল এবং দুইহাত দিয়া মাটিতে একটি আসন করা হইল। উহার উপর বসিয়া মাটিতে মাথা রাখা হইল। পূর্বে কখনও কাহাকেও এইরূপ আসন করিতে দেখা হয় নাই। তাহার উপর স্থির হইয়া বসিয়া আপনভাবে মন্ত্রাদি সহযোগে আচমন, জলশুদ্ধি, সূর্যপ্রণাম ইত্যাদি সন্ধ্যার সমগ্র ক্রিয়াদি হইয়া গেল পরে আপনাতেই সব দেব দেবী সেইভাবে শরীরের উপর হাত নাড়িয়া নাড়িয়া কোন কোন জায়গায় গিয়া মুদ্রাদি সহ পূজা হইতে লাগিল। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদিও নিবেদিত হইল। অন্যান্য দিন স্থিরভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কখনও কখনও উপুড় হইয়া মাথা মাটিতে পড়িয়া থাকিত। কখনও অনেকক্ষণ স্থায়ী হইয়া শরীর কেমন একটা অসাড়ের মত আপনভাবে পড়িয়া থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল মন্ত্র ও স্তোত্রাদি উচ্চারিত হইল। এই পূজা শেষ হইলে চিৎভাবে দুই হস্তের দ্বারা ব্রহ্মতালু হইতে একটি দেবতা বুকের উপর দিয়া নামাইয়া সম্মুখে মাটিতে কোনও আসনে (আসন ইত্যাদি সব কিছুই স্বয়ং প্রকাশ) রাখিয়া আবার উক্তরূপে পূজা হইলে। তারপর যেইরূপে নামান হইয়াছিল ঠিক সেইরূপে অতি সন্তর্পণে সেই আসন হইতে দেবতাকে তুলিয়া ব্রহ্মতালুতে আপনাতেই বিলীন করিয়া সর্বাঙ্গে হস্ত স্পর্শ করা হইল। সন্ধ্যা পূজার বিধানাদি এ শরীরের ক্রিয়ার অনেক বৎসর পরে লোকমুখে যেমন অবগত হওয়া গিয়াছিল, ঐ সময়েতে এক এক করিয়া সবই যথাযথ ভাবে আপনা হইতেই শরীর দিয়া হইয়া গিয়াছিল। শরীরটা যেন যন্ত্রের মত চালিত হইয়া কি এক বিচিত্র ভাবে অনুষ্ঠান সমাধা করিয়াছিল।

এই কর্মাদি সমাপ্ত হইলে বেলা শেষ হইয়া গেল। দিনে আর খাওয়ার সময় হইল না। রাত্রে পাকের আয়োজনাদি করিতে গেলাম। রাত্রে ভোলানাথকে খাওয়াইয়া শরীরটা আবার বসিল। খেয়াল হইতে লাগিল দিনের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। পূর্বের মত

শারীরিক ক্রিয়াদি হইবার পর পূজার আয়োজনাদি হইয়া গেল। নানা বীজ ও মন্ত্রাদি সহ নানারূপ দেবতার পূজা হইল। পরে সায়ং সন্ধ্যা শেষ করিবার মত ক্রিয়াদি হইল।

খাইয়া উঠিতে দেখি ভোর হইবার আর দেরী নাই। একটু গড়াইয়া নিলাম। পরে যাইয়া ভোলানাথের সেবার সব গুছাইয়া রাখিয়া আবার প্রাতঃকর্মের জন্য যেমন বসে তেমনই বসিলাম। পূর্বের মত ক্রিয়াদি হইয়া সন্ধ্যার পর পূজাদি হইল। একেরই বহুরূপ ত। তাই বহু ভাবে বহু রূপে পূজা হইল।

ঝুলন রাত্রি হইতে আরম্ভ হইয়া পরে কত মূর্তি লইয়া কত কত রূপের প্রকাশ এবং দেব দেবীর রূপ ও কত ভাবের যে প্রকাশ হইল ইয়ত্তা নাই। বাহিরে কখনোও দেখা হয় নাই বা শোনা হয় নাই এই প্রকারও অনেক মূর্তি ছিল।

প্রঃ — মা! এই যে 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ' শব্দটি শ্রীমুখ হইতে বাহির হইল, এখানে এ প্রশ্ন ত আসে যে — ইহা কি সাধনলব্ধ স্থিতির কথা? না, ঐ চরম পরম স্বয়ং? ইহা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে উত্তরে মা বলিলেন — আরে! এই ছোট্ট মেয়েটা ত যা-তা। তাই-অ প্রকাশ। সাধনার গতিতে কি এই কথা? তোরা চতুর্ভূজ মূর্তিই কি কেবল ভাবছিস্? একটু পরেই গম্ভীরস্বরে বলিলেন — আমাকে জানিতে চেষ্টা কর — যেখানে নির্দ্বন্দ্ব। এ মন দিয়া কি দ্বন্দ্ব মিটাইবি?

পূজা আরম্ভ হইবার পূর্বে একটি বীজ ভিতরে জাগিত ও পরে তাহা মুখে ফুটিত। সঙ্গে সঙ্গে বীজাত্মক দেবতার রূপ ও গুণাদি প্রকাশ পাইত। সেই অনুযায়ী আসন, মুদ্রা, ধ্যান, প্রণাম প্রভৃতি এ শরীরের উপর হইয়া যাইত। এই রূপ ভাবে একে একে বহু মূর্ত প্রকাশাদি এ শরীরের উপর হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস, আসন, মুদ্রাদির অনেক রকম যাহা বাহিরে কোথাও কাহারো কাছে দেখা বা শোনা হয় নাই তাহার প্রকাশ। কিছু সময়ের জন্য যখন এদিক ওদিক চাহিতাম, কেবল সর্বত্র হলদে রং, কখনও গাঢ় কখনও ফিকা এইরূপ দেখা যাইত। একটা সময় এইরূপ গিয়াছে। ইহার ভিতর একটা ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল — এ শরীরটা যেদিকে তাকাইত ও যখন যেভাবে পূজা ইত্যাদি হইত তৎভাব ও তৎস্বরূপ একমাত্র, এই প্রকাশ থাকিয়া আবার অন্য ধারায় আরম্ভ হইত। কোন সময় কোন

মূর্তিকে দেখিয়া, এ সব দেবদেবী কাহারা — এই জিজ্ঞাসা আসিত। সে সব দেবদেবীর এদিকে পূজা ইত্যাদির বিশেষ প্রচলন নাই। তখনই আবার আপনার মুখ দিয়াই উত্তর বাহির হইত এবং আপনার কাছেই সুমীমাংসা ও সেই তত্ত্বাদির প্রকাশ হইত। বিনা বাহ্যিক উপচারে কেবল শরীর ও ক্রিয়াদির দ্বারাই আপনা হইতেই আপনিই সবকিছু সৃষ্টি হইয়া যাইত। আবার শুধু মন্ত্রের দ্বারাই পূজা ইত্যাদি হইয়া যাইত। এসব সাধারণ চিন্তা বা বিচারের কোন কিছুই নয়। যাহা কিছু যেখানে প্রয়োজন তদ্রূপ আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া যাইত।

ঝুলনের পর হইতে নিমন্ত্রণাদিতে আর যাওয়া হইত না। পরে আর একটি ভাব হইয়াছিল — কাহারো কিছু গ্রহণ নিষেধ। কিন্তু দেশাচার হিসাবে সধবাদের গ্রহণীয় জিনিষ, যেমন শাঁখা, সিন্দুর, পান ইত্যাদি যদি অপরের নিকট হইতে গ্রহণ না করিতাম ভোলানাথ অসন্তুষ্ট হইতেন। এই কারণে এইগুলি নিতাম। বাকবন্ধ অবস্থায়ও পাড়ার কাহারো বাড়ীতে নিমন্ত্রণাদি হইলে আমাকে আগ্রহ করিয়া রান্না করিবার জন্য লইয়া যাইত, আমি যাইয়া সব করিয়া দিতাম। কিন্তু নিজে খাইতাম না, এ জন্য অনেকে দুঃখিত হইত। পরে রান্নার জন্য এ শরীরকে ডাকা বন্ধ হইয়া গেল।

দীক্ষার খেলা ২/৩ মাস চলিতেছে — একবার এক সময়ে ভিতর হইতে কথা আসিল — এ ছায়া যখন দেখা যাইবে না তখন এ শরীর থাকিবে না। কেমন সুন্দর — আচ্ছা। তাহা হইলে ত এ শরীর, ছায়া না দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অদেখা — এ খেয়ালটা আসিল। কিছু দিন চলিল। পরে এক সময় হইল কি, হঠাৎ দেখা গেল — শরীরটি হাঁটিয়া যাইতেছে বা দাঁড়াইয়া আছে, নিজেই নিজে দেখিতেছে — একটা জ্যোতি, আলোর শরীর। অন্ধকারের মধ্যে সে আলো। সে আলোর দ্বারা অন্ধকারের মধ্যে বেশ চলা যাইতেছে, আবার দেখা গেল সূর্যের বা চন্দ্রের আলোতেও যেমন প্রদীপের আলো বা ইলেকট্রিক লাইট দেখা যায় — তেমন সূর্য চন্দ্রের আলোতে থাকিলেও এ শরীরের আলোর রূপটি বেশ দেখা যাইত। নিজেই নিজেকে দেখা যাইত। দাঁড়াইয়াও — যেদিকে তাকানো যাইত প্রমাণ মূর্তিতে এই আলোর দেহ দৃষ্টিপথে পড়িত। সেই আলোর রকমটাও যেন কিরূপ অবর্ণনীয় — কিছুর উপমাই চলে না। চন্দ্র সূর্যের আলোতে যেমন

শরীরের ছায়া — সেই ছায়ার পরিবর্তে ঐ আলোর রূপটিই দেখা যাইত। কোন সময় নীলাভ, কোন সময় পীতাভ, কোন সময় লালাভ ইত্যাদি রকমারিটাও। কখন শুভ্র জ্যোতিটাই প্রধান, কোনও সময় অন্যটাও প্রধান ইহাও হইত। এক জ্যোতি সব সময়। তখনই ভিতর হইতে সুমীমাংসা — আচ্ছা, তবে তো এই ছায়াও নাই, এই শরীরও নাই। এই তো সেই — দিব্য দেহ, চিন্ময়, তোমরা কত কি বল না, কত যে রকমারিটা। তখন এই দিকটাই আসিয়া গেল। মেঘ হইতে সূর্যোদয়ের মত কেমন একটা প্রকাশ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সমগ্র এক জ্যোতি — সেই মহা জ্যোতি ইহাও প্রকাশ।

এ দেখার পূর্বে যখন যোগাদির ক্রিয়া হইত, সূর্যের দিকেও দাঁড়াইয়া তাকানোর খেয়াল হইত সাময়িক। বাহির হইতে ভিতরে তাকাইবার সঙ্গে সঙ্গে পরক্ষণে চক্ষু বুজিলে বা খুলিলে দেখা যাইত সূর্যকিরণের যে লাল রং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই লাল জ্যোতি। সন্ধ্যা ও সকাল বেলায় আলাদা আলাদা। এ সাধারণ প্রকাশ নয়, সবগুলিই পূর্ণাঙ্গীন। বলা যাইতেছে না কিরকমটা। বাহিরের সমগ্র আলোটা চক্ষু বুজিলে ভিতরে দেখা যাইত, অন্ধকার ঘরে তাকাইলে সে ঘরেও দেখা যাইত, এমনও কখনও হইত। ইহার ভিতরে যে কোন সূত্রে যে কোন দিকে একটু তাকানো যাইতেছে — চন্দ্র সূর্যের আলোর ভিতরে গাছপালা, পশু, মনুষ্য ইত্যাদি সব কিছুর দিকে ঐ সূত্র সহ একটু স্থিরভাবে তাকাইলেই সেই প্রমাণমত আলো প্রধান হইয়া দেখা যাইত — শুভ্র জ্যোতির মত। কিছুক্ষণ থাকিয়া মিলিয়া যাইত, এ আলোর দেখাটি বেশ দিন দিন চলে, সব সময় শূন্যেতে নানা রকম কত কি যন্ত্র, নানা আকারে কত কি দেখা যাইত।

পরিচয় দান

দীক্ষার খেলাটা হওয়ার ৫/৭ দিনের ভিতর একদিন, সেইদিন ছিল সোমবার। সকলে যেইরূপ বসে সেইরূপ প্রাতে বসিয়াছি। বিশেষ কিছু ক্রিয়ার লক্ষণ নাই। সামান্য ক্রিয়াদির পর খানিক অপেক্ষা করিয়া রান্না করিতে গেলাম। নেশার মত ঢুলু ঢুলু ভাবে বসিয়াই রান্না শেষ করিলাম। সকলের খাওয়া দাওয়ার পর আবার যেমন সন্ধ্যা করিতে বসে তেমন বসিলাম। দিনে বসিবার সময় দরজা একটু

টানিয়া রাখিতাম। ভোলানাথ ও মামাত ভাই বাহির হইতে সেখানে আসিল। আপন ভাবেই সাধারণ ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছি। মামাত ভাই নিশিবাবু ভোলানাথকে বলিল — আপনি কিছু বলেন না? দীক্ষা হওয়ার পূর্বে এই সব ক্রিয়া কর্ম ভাল নয়। আপনি জিজ্ঞাসা করুন না, বসিয়া বসিয়া এই সব কি করিতেছে? এই কথা বলিয়া সে বাহিরে গেল। আবার আসিয়া ভোলানাথকে বলিল — জিজ্ঞাসা করুন না সে এইসব কি করে? তখন শারীরিক ক্রিয়াদি হইতেছিল। আপন ভাবে বসিয়া আছি। মামাত ভাই শরীরের এই সব কিছুই জানিত না। ভোলানাথ সহ আমার ডান পাশে বসিয়া বার বার ঐরূপ বলিতেছে। আবার বলিল — জিজ্ঞাসা করুন না। এই কথা বেশ খেয়ালের সহিত শুনা হইল। তখনই ঐ আসনে বসা অবস্থাতেই মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলাম — কিরে? কি জিজ্ঞাসা করবি? এত জোরের সহিত তেজপূর্ণ আওয়াজ ও দৃষ্টি এবং এইরূপ ভঙ্গি দেখিয়া মামাত ভাই ব্যস্ত সহকারে পিছন দিকে তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল, আর সন্ত্রস্ত ভাবে হাত জোড় করিয়া বলিয়া উঠিল — আপনি কে? এই শরীরের তৎমূহূর্তেই আবার হাসি ও শান্ত ভাব আসিল। মুখ হইতে বাহির হইল — কি? ভয় পাইয়াছিস? না, না—ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই। বলিতে বলিতে হাতখানি একটু সান্ত্বনার ভাবে উঠিয়া গেল। তখন এই শরীর আসন অবস্থাতেই উত্তরমুখ হইতে পূর্বমুখী হইয়া গেল।

মামাত ভাই বয়সে বড় ছিল। তাহাকে ঠাকুরভাই বলিয়া ডাকিতাম। দেশের প্রথানুযায়ী বড় ভাই বলিয়া তাহার সামনে কখনও ভোলানাথের সহিত কথা বলিতাম না। ঘোমটা দিয়া থাকিতাম। সেই সময়ে বাতাসে গায়ের কাপড় উড়াইয়া নিবার মত লজ্জা সঙ্কোচের ব্যবহারটা তন্মুহূর্তের জন্য একেবারে সরিয়া গিয়াছিল। বুকে পিঠেও কাপড় ভালমত ছিল না। এই শরীরটা বেশ খেলিতেছিল, আল্‌গা দ্বিতীয় ব্যক্তির মত। ঠাকুরভাই ও ভোলানাথ যখন জিজ্ঞাসা করিল — আপনি কে? ধীরে ধীরে মুখ দিয়া বাহির হইল — পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। স্ত্রী শরীর বলিয়া নারায়ণকে নারায়ণী, নিজেরা বিশেষরূপে সমালোচনা করিতে করিতে পুনরায় দুইজনেই রকমে রকমে "আপনি কে" বারবার জিজ্ঞাসা করায় "মহাদেব" "মহাদেবী", "নারায়ণ" "নারায়ণী" ইত্যাদি সব বাহির হইল। ভোলানাথ

জিজ্ঞাসা করিল — তুমি যদি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ এবং এই সবই হও, তবে এখন একটু অস্বাভাবিক ভাবে কথা বলিতেছ কেন? তখন বলা হইল — উপস্থিত মানব রূপে শরীরটা দেখাইতেছে কিনা তোমাদের কাছে, সেইমত ব্যবহারটার প্রকাশ খেলিতেছে। ভোলানাথ আবার জিজ্ঞসা করিল — তুমি কি করিতেছিলে? বলা হইল — সন্ধ্যাপূজা হইতেছিল। ভোলানাথ বলিল — তুমি ত দীক্ষা নাও নাই। মুখে বাহির হইল — গত ঝুলনের রাত্রিতে তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল — আমি কে? উত্তর বাহির হইল — সেই তাই, মহাদেব। আমার দীক্ষা কবে হইবে? মুখ হইতে বাহির হইল — অগ্রহায়ণ মাসে। ভোলানাথ বলিল — কোন তারিখ? মুখ দিয়া বাহির হইল — ১৫ই তারিখ। বার ইত্যাদি জিজ্ঞাসায় সবই বলা হইল। আবার ঠাকুরভাই ও ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল — কে দীক্ষা দিবে? নিজেকে দেখাইয়া দেওয়া হইল — আমি। তখন তাহারা পঞ্জিকা আনাইয়া বার ও তারিখ মিলিয়াছে দেখিতে পাইল এবং সে তারিখ দীক্ষারও প্রশস্ত দিন। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া ভোলানাথ প্রশ্ন করিল — আচ্ছা বল দেখি সেইদিন কোন নক্ষত্র? তখন মুখে নক্ষত্রের নাম বাহির হইল। ভোলানাথ বুঝিতে পারিল না, কারণ সকল নক্ষত্রের নাম তাহার জানা ছিল না। তখন মুখে বাহির হইল — ঐ বাসার জানকীবাবু এখনও কাছারি যায় নাই তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা তথায় যাইবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছে, ইতিমধ্যে এই শরীর উঠিতে চায় এবং মুখে বাহির হয় — তবে আমি যাইয়া জানকীবাবুকে নিয়া আসি? এইরূপ এলোমেলো বেশে এই শরীর পাছে নিজেই তাহাকে ডাকিতে যায় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ভোলানাথ নিজে গিয়াই জানকীবাবুকে ডাকিয়া আনিল। জানকীবাবু আসিয়া বলিল — তিনি ঠিক নক্ষত্রই বলিয়াছেন। এই সব প্রসঙ্গে মুখ হইতে রোহিণী নক্ষত্রের নাম বাহির হইলে এই সব কথা নিয়া তাহাদের নানা রকম জিজ্ঞাসা ও নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ঘন্টার পর ঘন্টা চলিতেছিল। তখন এক সময়েতে তাহাদের "রোহিণী নক্ষত্র কে" এই কথা জিজ্ঞাসায় মুখ হইতে ইহাও বাহির হইয়াছিল— রোহিণী নক্ষত্রে যে, এও সেই-ই।

জানকীবাবুও আবার জিজ্ঞাসা করিল — আপনি কে ? তখন শান্তভাবে আস্তে আস্তে বাহির হইল — পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। তখন জানকীবাবু বলিল — আপনি শয়তান। অনেক পরে আবার বলিল —আপনি শয়তান, শয়তানী। তখন এই শরীরের খুব হাসি আসিতে লাগিল। আর মুখে বাহির হইল — যাহা বলিয়াছি, তাহাই। তোমরা যে যাহাই বল না কেন। তোমরা ত পরীক্ষা করিতেছ। তখন আবার বলে — আপনি যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তাহার প্রমাণ কি ? মুখ হইতে বাহির হইল — দেখিতে চাও ? ইহা বলিতে বলিতেই এ শরীরের কেমন একটা সুন্দর ভাব হইল। জানকীবাবু ও ঠাকুরভাই একটু দূরে আলোচনা করিতে লাগিল। এ শরীর ভোলানাথকে নিকটে বসিতে বলিল। একটি মন্ত্রের সহিত হাতের দ্বারা ভোলানাথের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করা হইল। ভোলানাথ "ওঁ" শব্দ করিতে করিতে আপনা হইতে কলের পুতুলের মত স্থির ভাবে মাটিতে আসন করিয়া বসিয়া গেল। প্রস্তর মূর্তির মত অর্ধ উন্মীলিত ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া এত অচল ও শান্ত হইয়া বসিয়া গিয়াছিল যে ইতিমধ্যে স্কুল হইতে আশু আসিয়া অনেক সময় পর্যন্ত তাহার এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ শরীর বেশ স্থির ভাবে বসিয়া তামাসা দেখার ন্যায় দেখিতেছে। ঠাকুরভাই জানকীবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিল।

জানকীবাবু আসিয়া একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল — আচ্ছা। এখন রমণীবাবুর (ভোলানাথ) স্বাভাবিক অবস্থা হউক, এই আমাদের প্রার্থনা। কিছুক্ষণ পর এ শরীর আবার ভোলানাথের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করিলে ক্রমে ক্রমে তাহারা যেরূপ চাহিয়াছিল প্রায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। ভোলানাথ বলিয়াছিল — আমি এতক্ষণ যে কি আনন্দে কোথায় ছিলাম তাহা অবর্ণনীয়। বেলা প্রায় শেষ হইল, আবার লজ্জা, ভয় ইত্যাদি কাপড়ের মত পরিধান করিয়া সংসার কর্মে ব্যাপৃত। এই স্থানে মাকে প্রশ্ন করা হইল — আচ্ছা, ভোলানাথের যে এই অবস্থা — ইহার পরিণামে কী হইতে পারিত ? এ-ই কি ? উত্তরে মা — এ তো স্পর্শ। এ-ই কেন, স্বরূপ স্থিতির দিক পূরণ। এ তো আর ভেলকি দেখানো নয়। আবার বিশেষ কান্নাকাটি ও আবদারে, তাহারা বারবার হাত জোড় করিয়া যখন বলিতে লাগিল —রমণীবাবুকে স্বাভাবিক স্থিতিতে ফিরাইয়া আনিয়া

দিন, তখন আবার স্বাভাবিকে আসিয়াও তাহার ভাব ভঙ্গীতে প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও সব ব্যক্ত করিতে পারিল কি ? সব তো ব্যক্তও হয় না, ও যে অনাময় অব্যক্ত। এই স্পর্শ — মূলে সাময়িকই বুঝিও না। দেখ ঐ স্থিতিতেও এই জগতের তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে এইটি মনে রাখিও।

এই জানকীবাবুই উষাদিদির স্বামী। বড় ধীর ও সরল প্রকৃতির লোক। পরে শুনিলাম সে আমাকে চটাইবার জন্য ঐ সময়তে বারবার শয়তানী বলিয়াছিল। সে ইহাও নাকি মনে করিয়াছিল যে মানুষের উপর যেমন দেবতার আবেশ হয় এই শরীরের বুঝি সেইরূপ হইয়াছিল। পরে তাহার এই সন্দেহ নির্মূল হইয়া গিয়াছিল।

তাহার সামনে এই শরীর পূর্বে কখনও বাহির হয় নাই। সেইদিনই প্রথম দেখা ও আলাপ। পরে ঢাকা আশ্রমে এই শরীরের নিকট আসিয়া ঐ সকল তাহার মনের ভুল ভ্রান্তি বলিয়া হাসিত ও আনন্দ করিত। এই সব ভাব দেখিয়া তিনি নাকি অবাক ও আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। পরে তাহার এই শরীরের উপর কেমন একটা অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিশ্বাসের ভাব আসিয়াছিল।

সাধনার খেলায় মা

ব্রহ্ম বা দেব দেবী ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব জানা ছিল না। কাহারো মুখে শোনাও নাই বা কোন পুস্তকেও পড়া নাই। এই প্রথম এ মুখে বাহির হওয়া ত। পূর্বে যেমন আপন ভাবেই পূজা মুদ্রা ও আসনাদি শরীরে প্রকাশ পাইয়াছে ইহাও তদ্রূপ। তিথি নক্ষত্র বা পঞ্জিকারও কোন দিন কোন সন্ধান ছিল না। ভোলানাথ ও মামাত ভাই যখন ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল সেই সময়ে এই শরীরে সন্ধ্যা পূজার ভাবে পূজাদির ক্রিয়া হইতেছিল।

রাত্রিতে সকলে খাওয়ার পর আবার বসিয়াছি। শরীরের ক্রিয়াদির পর আসনে স্থির হইয়া বসিলে পূর্বের মত মাটিতে হাত দিয়া আর একটি নূতন রকমের আসন হইল। তাহার উপর বসিলাম। সন্ধ্যা পূজার আয়োজনাদি হইল। সেইদিন দেখিলাম শরীরে আসন করিয়া বসা ও পূজা ইত্যাদি সবই নূতন রকমের হইল। তাহার পর হইতে একবেলা যে আসন হইত অন্য বেলায়

তাহা হইত না। পূজা জপও বিভিন্ন প্রকার হইত। রূপ, গুণ, বীজ, ধ্যান ইত্যাদি লইয়া এক এক সময় আলাদা আলাদা দেবতা। প্রথম রাত্রির বীজমন্ত্রটি সর্বদা স্মরণে থাকিত। কিন্তু নিয়মিতভাবে কর ধরিয়া জপ করার ভাব বন্ধ হইয়া গেল। সব সময়ই কিন্তু একবার যাহা পূর্ণাঙ্গীন হইত, পরে আর তাহা হইত না। আসনের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ মন্ত্র ও স্তোত্রাদি মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকিত। এক একটি নূতন আসন হইত আর চোখ বুজিয়া যাইত। আর আপন হাত দিয়া আপন মাথায় পূজা হইয়া যাইত। খেয়াল হইত — আমিই পূজক, আমিই তন্ত্রধারক, আমিই পূজ্য দেবতা ও জিজ্ঞাসু, আমিই দর্শক ও শ্রোতা। শরীরের এই প্রকারের প্রত্যেক ভাবগুলি একাদিক্রমে দিনে দিনে পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিত।

বৈষ্ণবেরা মন্ত্রাদির সহিত যেভাবে তিলকাদি দেয় বা শাক্ত ও শৈবেরা যেরূপ সিন্দুর কুম্‌কুম্ চন্দনাদি লাগায় ব্রহ্মচারীরা যেইরূপ বিভূতি চিহ্নাদিতে ভূষিত হয়, যথাযথ স্থানে এবং যথাসময়ে এইগুলিও এই শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। সময়মত আবার কিন্তু সন্ন্যাসীর ক্রিয়াদি ও লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছিল, পূর্ণাঙ্গীন মন্ত্র সহ।

তখনকার ভাবের গতি ভাষায় বোঝান যায় না। এই পর্যন্ত বলা যায় যে বহুবিধ দেবরূপের পূজা ইত্যাদি প্রকাশ এই শরীরে হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে ঐ সময় কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কখনও কখনও লজ্জাবতী লতা যেইরূপ আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া যায় সেইরূপ চুপ হইয়া যাইতাম। কেহ দেখিতে গেলেও ক্রিয়াদি সঙ্কুচিত হইয়া ভিতরের দিকে বন্ধ হইয়া যাইত। এইরূপে আপনা আপনি সব বিষয়ই গোপন হইত। আবার কখনও যেখানে যতটুকু প্রকাশ হওয়া দরকার ততটুকু স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িত।

এ শরীরে যখন পূজাদি আরম্ভ হইল, তখন দেখা গিয়াছে, যে যে দেবরূপের পূজা, সেই আসন মুদ্রাদি হইয়া তৎস্বরূপে পূজাদি হইত। পূজা আরম্ভের পূর্বেও ক্রিয়া চলিত। পূজার সময় ত চলিতই, পূজান্তেও আবার যেইভাব থাকা দরকার তাহাও হইত। যদিও বিভিন্ন রকম।

এই শরীরের উপর যখনই ঐরূপ পূজাদি হইত, শরীরের আসন ও দেবদেবীরা যে যে ভাব ও আসনে প্রকাশিত তাহাই হইয়া যাইত।

দেবতা পূজাদির পূর্বে এ শরীরে যে আসন প্রকাশ থাকিত তাহার সহিত উপরোক্ত আসনাদি বিভিন্ন। কোন্ দেবতার কি কি গুণ ও কাহার কোন রূপ, কি ভাব তাহাই হইয়া যাইত এবং সম্পূর্ণ তৎ-স্বরূপে প্রকাশ হইত। এ শরীর ঐ সময়ে একা ঘরে ঐ ক্রিয়াদি নিয়া থাকিত বলিয়া স্বাভাবিক লোকসঙ্গ প্রায় না হওয়ার দরুণ বাসায় অন্য লোকের সমাগম প্রায়ই হইত না। যখন সাংসারিক কাজ কর্ম করিতে যাওয়া হইত শরীরের গতি হাঁটা চলা দৃষ্টি ঐ সব ক্রিয়ার সময়ে যে যে স্থিতি, সেইভাবে প্রকাশ থাকিত। আবার বিশেষ ভাবের কথা, কেহ যেন বুঝিতে না পারে সেইরূপ নিজের সংবরণ ভাবটাও তখন প্রকাশ থাকিত। অর্থাৎ যে স্থিতিতে যতটুকু স্বাধীন শক্তির প্রকাশ হওয়া তাহার ক্রিয়া দেখা যাইত।

বাজিতপুরে সাধনার এই খেলাটা যখন চলিতেছিল তখন ইহার ভিতরে প্রথম দেখিতাম একটি শির শির ভাব নাকের দুই শিরার ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বদিকে যাইয়া ভ্রুর মধ্যে সামান্য কতটুকু কপাল জড়াইয়া স্থির হইয়া আছে। ধীরে ধীরে উহা তালুতে যাইত ও একটু ভার ভা'র বোধ হইত। শরীর যেন খেয়াল করিয়া হাতে সংসারের কোন কাজকর্ম করিতে পারিতেছে না, যেন ক্রমে ক্রমে টলিয়া যাইতেছে, এইরূপ লাগিত। তখন এ শরীর যাইয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া বসিত, শরীরের ভাব যেন ঝিমু ঝিমু স্থির। কতক্ষণ বসিলে শরীরটা আপনা হইতে শুইয়া পড়িত। উঠিলে দেখা যাইত বাহিরের ভাবে ও কর্মে কোন আকর্ষণের প্রকাশ নাই। যেদিকে দেখি যেন ভোলা ভোলা আলগা আলগা ভাব। ইহাতে বুঝিবে যে ভিতরের গতি ও ভাবের প্রবলতায় বাহিরের কর্মভাবগুলি কমাইয়া দেয়। আর বাহিরের সব ভাব না ভুলিলে অন্তর্জগতের দরজা পূর্ণভাবে খোলে না।

ষটচক্রের গ্রন্থি-চক্রাদি

এই যে ষট্‌চক্রের গ্রন্থি-চক্রাদি আছে বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থিস্থলে যে বীজাদি নিহিত রহিয়াছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন দেবতা, মূর্তি, গুণ ও রূপাদি সহ আছে ত। কিন্তু জাগতিক হিসাবে জীবেরা যে যে সংস্কার নিয়া আসে, কি আসিবে, সেই সংস্কার অনুযায়ী তাহাদের

ততটুকু সেই সেই মূর্তরূপাদি প্রকাশ। তদনুযায়ী ততটুকু ক্রিয়াও তাহাদের হয়। সেই ক্রিয়াদি পূর্ণ হইলে এ দেবতা পূজা ও দেবভাব সংস্কারটি পূর্ণভাবে নির্মূল হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক ভাবের নিজের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের যে আকর্ষণাদি খণ্ড খণ্ড মূর্ত ভাবের প্রকাশ ও পূজা ইত্যাদির আকর্ষণ এবং জাগতিক দেহাত্ম বুদ্ধি নির্মূল হইয়া ঐ এক মহান ভাব সমুদ্রে ডুব দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ক্রমে ক্রমে সমগ্র মূর্ত ও অমূর্ত তত্ত্বের সুমীমাংসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে যাওয়া।

জীবন্ত দেবদেবীর প্রকাশ

এইরূপে দিবারাত্রি নানাভাবে সন্ধ্যা পূজাদির ক্রিয়ায় আরও কয়েকদিন চলিয়া গেল। একদিন ক্রিয়াদি করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর দেখি আর বিশেষ কিছু হয় না। তখন খেয়ালে আসিল আজিকার মত কাজ শেষ হইয়াছে। উঠিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া বিছানায় দুই এক মিনিটের জন্য একটু গড়াইলাম। ভোর হইলে সংসারের কাজকর্ম সারিয়া আবার বসিয়া গেলাম। সেইদিন দেখিলাম নিত্য শারীরিক ক্রিয়াদির পর একটি বিশেষ আসনে স্থির ভাবে বসিয়া গেলাম। শরীর যেন অবশ ও ঢুলু ঢুলু। শুইবার ভাব হইল, সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ শুইবার পর দেখি এক সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীতে ঠিক মানুষের মত এক জীবন্ত দেবীমূর্তি। সেই মূর্তিটি সিংহ-বাহিনী। ইহার পর যেখানে বসা হইত প্রায়ই দেখা যাইত, ঐ সিংহবাহিনী মূর্তিটি এ শরীরের কাছে বাম পাশে সিংহের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিছুদিন পর্যন্ত ইহা চলিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে অসাড় ভাবে তথায় পড়িয়া রহিলাম। উঠিলে দেখিলাম বেলা হইয়াছে। রান্না করিলাম, সকলকে খাওয়াইয়া আবার বসিলাম। কেমন আর একটা নূতন ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল। নানা ক্রিয়াদির পর একটু চুপচাপ পড়িয়া থাকার ভাব হইল। শুইয়া শুইয়া দেখিতেছি যে আবার একটি দালানে জীবন্ত মানুষের সমান দেব দেবীর অনেক মূর্তি। লক্ষণে ভিতরে প্রকাশ হইল ইহারা দেবতা। প্রচলিত যে মহাদেব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা

ইত্যাদি আছে তাহাদেরও নানা রূপাদিই। যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ, শিবপার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম এই সব যুগল রূপাদিও কত দেখা গেল। সাঙ্কেতিক কথার ভাব ও ইঙ্গিতাদি জাগ্রতভাব প্রকাশ ছিল। দেখা গেল ক্রমে ক্রমে এক একটি ঐ স্থানে মিলিয়া গেল। যেন তামাসা দেখিবার মত এই ঘটনা দেখিলাম। শরীরের দিকে কোন খেয়াল একেবারে নাই। পরে দেখি একটা নাট মন্দিরের চারিদিকে দেবালয়। ইহার ভিতর বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। ঐ স্থানটি যেন একটি আনন্দধাম। মূর্তিগুলিও ওখানে জীবন্ত প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের শরীর হইতে অলৌকিক শক্তি, তেজ, সৌন্দর্য বিকশিত হইতেছে। এইরূপে অনেক সময় কাটিয়া গেল। পরে দেখি সেই মূর্তিগুলি ও মন্দিরাদি সেইখানেই মিলাইয়া গেল। শরীরের অবশ অবস্থা। সর্বাঙ্গ ঢুলু ঢুলু। এইরূপ যখন দেবতাদি জীবন্ত দেখা হইত, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মন্ত্রাদিও মুখে উচ্চারিত হইত এবং তৎস্বরূপে গুণাদিও প্রকাশ পাইত। যথা সময়ে বরদানাদিও কোথায় কিরূপ হয়, তাহারও প্রকাশ হইত। অর্থাৎ বরদানে অধিকার প্রকাশ হইত। যাহারা সাধন করিয়া এই অবস্থা লাভ করে তাহাদের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাকে নানা মূর্তরূপাদির দেবতা-সিদ্ধ অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই সময়ে সাধকের সংস্কার অনুযায়ী বা কামনা-বাসনা অনুযায়ী বরলাভ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে অনেক কথা আছে।

অন্য আর একদিন যখন এইরূপ হয়, তখন উঠিলে দেখি শরীর, সেই বিবিধ মূর্তিভাবে পরিপূর্ণ এবং তাহা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছিল। কোন কোন সময় ইহারও প্রকাশ হইত — নানা দেবদেবী এবং আরও কত সব, প্রসন্ন মনে এই শরীরের কাছে দাঁড়াইয়া এই শরীরটাকে দেখিতেছে। সেই দেখিবার ভঙ্গি ও ভাব অবর্ণনীয়। এ জাতীয় কত রকমটাই যে!

প্রতিবেশীদের উপদেশ

একদিন দুপুর বেলা ক্রিয়াদির পরে, চুপ করিয়া বসিয়া আছি। পাড়া হইতে কয়েকজন মেয়ে মানুষ আসিয়া দরজা ধাক্কাইতে লাগিল। দরজা খুলিয়া দিয়া আবার বসিলাম। যাহারা আসিয়াছে তাহারা

এই শরীরকে ছোট বোনের মত দেখিত, আমি তাহাদিগকে দিদি ডাকিতাম। তাহারা শুনিয়াছে যে আমি দরজা বন্ধ করিয়া থাকি, আহার নিদ্রা নাই। কোন খারাপ দৃষ্টি পড়িয়াছে; কালের দৃষ্টি বা মহাকালের দৃষ্টি ইত্যাদি। ইহা ভাবিয়া এ কারণে আমার কাছে কেহ ভয়ে আসে না। কারণ পরে তাহাদের উপরও পাছে দেবতার দৃষ্টি পড়িতে পারে। এ বাসা হইতে অন্য এক বাসায় পুকুর ঘাটে যাওয়ার যে রাস্তা ছিল, তাহারা ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং ঘরের পিছন দিয়া যাওয়া আসা করিত। সেই হেতু আমাদের বাসা একান্ত হইয়াছিল ও এ শরীরের আপনভাবে থাকার সুযোগ হইয়াছিল।

যাহারা আসিয়াছিল তাহারা নানা রূপ উপদেশ দিল। বলিল — আমরা কি দীক্ষা নিই নাই ও সন্ধ্যা করি না? অসুস্থ হইলে ত আমরা কিছু খাইয়াও সন্ধ্যা করি, আপনিও কিছু খাইয়া বসিবেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল — আপনি কি পাইয়াছেন? এ রকম হইয়াছে কেন? হাসিলাম, বিশেষ কিছু মুখে আসিল না। একজন আমাকে বলিল — আপনি স্বামীর আদেশ নিয়া খাইবেন, পরে এই সব করিবেন। আমি বলিলাম — তিনি যদি স্বেচ্ছায় আমাকে বলেন তুমি খাইয়া কর, তবেই আমি তাহা চেষ্টা করিব। সে আরো বলিল — আমার গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা নিলে, তিনি সাক্ষাৎ সিদ্ধিলাভ করাইয়া দিতে পারেন। আরো কত কি বলিল। আমি বিশেষ উত্তর প্রত্যুত্তর না করাতে তাহারা চলিয়া গেল।

আমি উঠিয়া রান্না বান্নার ব্যবস্থা করিতে গেলাম। পরে ভোলানাথকে খাওয়াইলাম। তিনি খাইতে বসিয়া নিজ হইতেই বলিয়া উঠিলেন — কাল হইতে তুমি দিনে কিছুক্ষণ সন্ধ্যাপূজা করিয়া খাইবে, বাকি কর্মাদি পরে করিও। ইহা শুনিয়া পূর্বোক্ত স্ত্রী লোকটির সহিত যাহা আলাপ হইয়াছিল তাহা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন — আমার আপনা হইতেই একথা মনে উঠিতেছিল, কাল হইতে সে ভাবে ব্যবস্থা করিও। আমি বলিলাম — আচ্ছা। তখন একটা সাময়িক ভাব হইয়াছিল যে ভোলানাথ আপনা হইতে বলিলে যদি অনুকূল হয় তবেই। ভোলানাথ এ শরীরের কাছে শুনিয়া যেন খাওয়ার কথা না বলেন। আর একটা খেয়াল আসিত ত্যাগের দিকটা রাখিয়া যদি সেই জাতীয় খাবার আসে তবেই গ্রহণ নতুবা

নয়। অর্থাৎ যে নিয়ম বাঁধা হইল, সেই নিয়মের মধ্যে হইলেই খাওয়া তাহা না হইলে খাওয়াই নয়।

রাত্রিতে পূর্বের মতই বসিয়াছি। ক্রিয়াদির পরে সর্বাঙ্গ যেন অবশ। শুইয়া পড়িলাম। দেখি কি একটা বাড়ীতে এ শরীর চলিতে চলিতে গিয়াছে। তথায় দেখিতেছি এক জায়গায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, কালী, শিবদুর্গা, সীতারাম ইত্যাদি সব নানা মূর্তি স্থাপিত আছে। কিছু পরে সেখান হইতে এ শরীর আসিয়া পড়িল। এ শরীরটা যেমন এ বাড়ী ও বাড়ী পূর্বে যাওয়া আসা করিত এবং যেখানে যাহা আছে দেখাশোনা করিত, শরীরটা এ ভাবে একস্থানে পড়িয়া থাকিয়া অন্য স্থানে যাইয়া দেখা শোনার প্রকাশ। সে রাত্রিতে নানা রকম শরীরের ভাব প্রকাশ হইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত খালি মাটিতে পড়িয়া রহিলাম। এইভাবে অনেক সময় অতিবাহিত হইলে উঠিয়া খাইতে গেলাম। দেখি রাত্রি প্রায় শেষ।

শরীরটাকে এইভাবে থাকিতে দেখিয়া ঠিকা ঝি সরলার কেমন একটা ভাব হইয়াছিল। আমি না বলিলেও সে দেখিয়া শুনিয়া সব কাজ সুন্দর রূপে করিয়া রাখিত। একদিন সে একটা সামান্য অন্যায় কাজ করিয়াছিল অথচ, আমি বাহিরে তাহা দেখি নাই। হঠাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হইল — তুই বুঝি ইহা করিয়াছিস্? এই কথা বলিয়া যে স্থানে সে জিনিষটা রাখিয়াছিল, সেই স্থানে উহাকে লইয়া এ শরীর চলিয়া গেল। ও তো দেখিয়া অবাক, এই মাত্র এই কাজটা করিয়া দরজা খুলিয়া এ শরীরের ঘরে সবে ঢুকিয়াছে। সেইদিন হইতে তাহার যেন একটু ভয় হইল এবং আরও মনোযোগ দিয়া অতিরিক্ত কাজ পর্যন্ত করিয়া দিত।

সাধনার খেলায় একটি কুকুর

এই সব ভাবের সময়ে আর এক সহায় ছিল একটি কুকুর। যাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। রাত্রিতে দেখিতাম যে পর্যন্ত এ শরীর ক্রিয়াদি শেষ করিয়া বাহিরে না আসিত সে ঘরের দরজায় বসিয়া থাকিত। অন্য সকলে ঘুমাইত, কেবল সে এই শরীরের সঙ্গে সারারাত জাগিয়া থাকিত। জিনিষপত্র খোলা থাকিলে বিড়াল প্রভৃতি হইতে পাহারা দিত।

এই সব যখন হইতেছিল উষাদিদিও খুব কমই আসিত। কারণ তাহার স্বামীর ইচ্ছা নয় যে এই অবস্থায় আমার সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে। পরে ঢাকা আশ্রমে আসিয়া স্বামীস্ত্রী এই সব বলিয়া হাসিয়া আনন্দ করিত।

সন্ধ্যা পূজায় বাহিরের দিক দিয়া ফুল, বেলপাতা, চন্দন, কোশাকুশি, পুষ্প পাত্র জল, বাতি ইত্যাদি ব্যবহার করিবার খেয়াল আসিত না। এই উপলক্ষ্যে সমুদয় কাজ আপনা হইতেই দৃষ্টি প্রকাশ হইয়া সম্পাদিত হইত।

একদিন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে ভোলানাথ জপ করিতে বসিলেন। তাঁহার জন্য কোশাকুশির ব্যবস্থা করিলাম। পাশে আমিও বসিলাম। ভোলানাথ আচমন করিয়া কোশাকুশিটি আমার দিকে দিল। কিন্তু বাহ্যিক জলের দ্বারা আচমনের ভাব হইল না।

সংসার আশ্রমে পতি-সেবা

একদিন প্রাতে স্নান করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছি। ভোলানাথ কাছারিতে যাইবেন আমি প্রণাম করিলাম। আমার নিয়ম ছিল তাঁহাকে নিত্য প্রণাম করা, প্রত্যহ তাঁহার চরণামৃত নিতাম, তাহা নিলাম। এই সব ক্রিয়ার ক্ষেত্রে চরণামৃত পূর্ব হইতে কখনও রাখা থাকিত। কর্মশেষে ঐ চরণামৃত গ্রহণ করিয়া খাওয়া দাওয়া হইত। ইহার ভিতরে বে-খেয়ালে যেদিন চরণামৃত রাখা হইত না, সেইদিন ভোলানাথ কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহা গ্রহণ করিয়া তবে আহারাদি হইত। পতি দেবতা হিসাবে সংসারাশ্রমে এইরূপ করিতে হয়। পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম — আমি তোমাকে আরতি করিব, তুমি একটু এইখানে থাক। এই বলিতে বলিতে শরীরের কেমন একটু অস্বাভাবিক অবস্থা হইল। সর্ব শরীর হেলিয়া দুলিয়া ভাব বিহ্বল অবস্থায় দাঁড়াইয়া গড়াইয়া বসিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ আরতির মত করিলাম। তিনি কাছারি চলিয়া গেলেন।

এ শরীর কাজে বসিল। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া হইতে হইতে মাটিতে চিৎ হইয়া শুইয়া পদ্মাসন অবস্থায় মাথা পিঠের দিকে যাইয়া ও বুক উঁচু হইয়া ধনুর মত একটি অসাধারণ আসন হইয়া গেল। মাথাটি এপাশ ওপাশ ও উর্ধ্বদিকে ঘুরিয়াছিল এবং জিহ্বাও এপাশ

ওপাশ ঘুরিয়া এ মাথার উপর দিয়া তিন বার মাটি স্পর্শ করিয়াছিল। এই অবস্থায় হাত দুইখানি মাথার দিক হইতে ঘুরিয়া পদ্মাসন ছুঁইয়া আসিয়া বুকের মাঝখানে মুদ্রাদির দ্বারা পূজার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। পূজা হওয়ার পরে দেখিলাম শরীর একইভাবে আসনস্থ আছে। খেয়ালে আসিল, এ শরীর স্বাভাবিক কিরূপে হইবে? কেননা নড়িলেই কোথাও মচকাইয়া হাড় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ইহা ভাবিবার একটু পরেই দেখি শ্বাসের গতি ক্রমে পরিবর্তন হইতে হইতে শরীর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিতে লাগিল। এক একটি ক্রিয়া ধীরে ধীরে হইতে বেশ একটু সময় লাগিয়াছিল। দেখিলাম সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে সেদিনও আর খাওয়া হইল না। কেবল আদেশ পালনের জন্য সামান্য একটু চরণামৃত মুখে দিলাম। ঘরে বাতি দিলাম, ভোলানাথের পা ধোয়ার জল ইত্যাদি ঠিক করিয়া রান্না করিতে গেলাম।

ভোলানাথ আসিলে তাঁহাকে দেখিয়া এ শরীরের আরতি করিবার ভাব আবার জাগিল। তাঁহার উপর আরতি করিলাম। পরে তিনি আহারাদি করিলেন এবং আমাকে খাইতে বলিলেন। তাঁহার আদেশ পালনের জন্য খাইলাম।

আবার আসিয়া বসিয়াছি, দেখিলাম শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া ভাল হয় নাই, খুব জোর লাগে। কেমন একটা চাপা চাপা বোধ হয়। শরীরটা অস্থির এবং সবই যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। ভোলানাথকে বলিলাম, বোধ হয় আহার করাতে এইরূপ হইল। তিনি বলিলেন, তোমার যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই কাল হইতে করিও। তোমার এইসব যে কি আরম্ভ হইল কিছুই বুঝি না। মানুষেও নানা রূপ বলাবলি করে। বলে আমি স্ত্রৈণ। তোমাকে বলিলে পাছে কিছু খারাপ হয় এইজন্য এইসব বলিও না। কি যে করিব তাহা ভাবিয়া পাই না। এ শরীর বলিল — তুমি যাহা বল, যতটুকু পারি তাহাই আমি করিতে চেষ্টা করিব। তবে এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে এইসব খারাপ কিছু নয়, ইহা নিশ্চয় জানিও। তুমি বাধা দিলে ভাল কি খারাপ হয় তাহা তোমাকে বলা আসিতেছে না। এইসব শুনিয়া তিনি আরও চিন্তায় পড়িয়া গেলেন।

আমি যে সারাদিন খাই না অথচ সংসারের কাজ কর্ম সবই চালাই, ইহাতে কেহ কেহ বলে — তিনি যে স্নান করিতে যাইয়া

লক্ষ্মীর আসনের জন্য ঘটি ভরিয়া জল নিয়া আসেন আর দরজা বন্ধ করিয়া বসেন, নিশ্চয়ই ঐ ঘটি হইতে জল খাইয়া পিপাসা নিবৃত্ত করেন। নতুবা এইভাবে কিছুই না খাইয়া থাকেন কি করিয়া? আরও কত রকমের কথা। আমি শুনি আর হাসি। যাঁহার ধারণায় যতটুকু আসে সে ততটুকুই ত বলিবে। কাহারো কোন দোষ নাই।

ভয়ের স্বরূপ

একবার খেয়ালে আসিল যে সময়ে ৩।৪ দিন স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যা আহ্নিক করে না আমিও করিব না। দেখিতে পাইলাম সে অবস্থার মধ্যেও শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া ও পূজাদি ভিতরে ভিতরে সবই চলিল। বাহিরে আসনাদি বা অঙ্গাদি সঞ্চালন তেমন ভাবে হইল না মাত্র। শরীরে যেন সর্বক্ষণ নেশার মত ভাব থাকিত। সে সময় একদিন রাত্রে প্রত্যক্ষ একটি কালো বিরাট মূর্তি গায়ের কাছে দেখিলাম। সাধারণে এইরূপ কেহ দেখিলে ভয় পাইত। কিন্তু এ শরীরের এমনি গতি ভয়ের কথা খেয়াল হইতেই — সে কে? কাহাকে ভয় দেখায়? একেরই ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই ভয় ত সংস্কারের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। অল্পক্ষণ থাকিয়া হাসিতে হাসিতে সেই মূর্তিটি সেই স্থানেই মিলাইয়া গিয়াছিল।

আজ সকালে স্নান করিয়া বসিতে যাইয়া খেয়াল হইল, আজও সন্ধ্যা হইতে পারে না শাস্ত্র নিয়মে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও খেয়ালে আসিল যে তাঁহার নামে ও তাঁহার চিন্তায় শরীরের আবার পবিত্রতা অপবিত্রতা কি? তাঁহার জপ কর্ম যেখানে — তিনি ত নিত্য সত্য, নিত্য শুদ্ধ। এই সব ভাবিতে ভাবিতে চুপ করিয়া বসিয়া আছি দেখি কি পূর্বের মত ক্রিয়াদি ও পূজাদি বাহিরে ভিতরে হইল। বাস্তবিক অন্তঃক্রিয়া আরম্ভ হইলে অবাধ গতিতে ঐ প্রকাশ স্বাভাবিক।

ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্ময় বাণলিঙ্গ শিব

আবার চোখ বুজিয়াছি ভ্রূর মধ্যখানে একটি ছোট বাণলিঙ্গ শিবের আকার দেখা গেল। যেই দিকে ঘুরি সেই দিকেই ঐটি স্থির দেখিতে

পাই। বাদামের মত বড়, আগুনের রং। চক্ষু মেলিয়াও সেইরূপই দেখি। ক্রমে সেই আকারের জ্যোতিটি দিনের বেলায় প্রজ্বলিত সেই উজ্জ্বল অগ্নি রংয়েই চোখের সামনে আসিয়া ভ্রূমধ্যে মিলাইয়া গেল। ইহার মধ্যেও সেই যে কিরূপ প্রকাশ, প্রত্যক্ষ কিন্তু। তখন দেহটি স্থির, ধীর, গম্ভীর, শান্ত। কেমনই বলা যায় না। আবার যখন খেয়াল হইত তখনই দেখা যাইত। এইরূপে বেলা প্রায় শেষ হইল। রান্নাদি করিয়া ভোলানাথকে খাওয়ান হইলে, রাত্রিতে আবার বসিলে আগেকার মত সামান্য কর্মাদিতে কাটিয়া গেল।

পরদিন অনেক বেলা হইলে রান্না ও ভোলানাথের খাওয়া শেষ হইলে বসা হইল। সেইদিন নিয়মিত ক্রিয়াদি হইয়া গেল। ভ্রূমধ্যে একটি বড় আলো ফুটিয়া উঠিল। ঐটি লক্ষ্য করিতে করিতে এক আসনে অনেক সময় কাটিয়া গেল। পরে চোখ খুলিয়া গেলে যেদিকে চাওয়া হয়, দেখা যায় কপালে সেই আলো স্থির রহিয়াছে। এইরূপে অনেকক্ষণ পরে ওইখানেই অদৃশ্য। রাত্রিতে বসিলে আবার সে আলোটি ভ্রূমধ্যে উদয় হইল। ক্রমশঃ উহা হালকা রং হইতে লাগিল এবং উহার চারিদিকে রিংএর মত খানিকটা, ধর না কখনও লাল, কখনও সাদা বা হলদে বা কালো ইত্যাদি এইরূপ নানা রংএর খেলা অনেকক্ষণ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। এই শরীরটা কতক্ষণের জন্য অসাড়, অজ্ঞান নয়, এইরূপ হইয়া রহিল। এইরূপ নানা ভাবে রাত্রি শেষ হইয়া গেল।

ইহার পর হইতে প্রায় সব সময় যেই দিকে তাকাই — মানুষ, গাড়ী, বাড়ী, ভালমন্দ যাহাই দেখি না কেন প্রত্যেকটার চারিদিকে তেজ ও জ্যোতি দেখা যাইত — ময়লা চন্দনের অপেক্ষা থাকিত না। গাছের আড়াল হইতে সূর্য্যের তেজ বাহির হইলে যেমন দেখায় সব জিনিষেরই ঐ রকম দেখা যাইত। ইহা স্থানের বা সময়ের অপেক্ষা রাখিত না। একটু তাকাইলে এই রূপই সর্বদাই দেখা যাইত।

সাধনার খেলায় স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া ও প্রকাশ

চিন্তায় এবং বাণীতে কোন বিষয় আসিলেই রূপে যে পরিণত প্রকাশ হয় জীব জগতে সাধনায় এই জাতীয়টা সম্ভব। কুণ্ডলিনী ও

নানা চক্রের খেলা আরম্ভ হইলে হলুদ নীল প্রভৃতি নানা রংয়ের জ্যোতি প্রকাশ পাইতে পারে।

জপের একনিষ্ঠতায় এবং চিন্তার ধারা লইয়া বসিলে কেহ কেহ অনেক সময় মানস চক্ষে দেখিতে থাকে যেন তাহার সঙ্গে আরও অনেক সূক্ষ্ম মহাত্মা মূর্তিরূপে বসিয়া আছেন। অনেক সময় পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি নানা রকম সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যও ভাসিয়া থাকে। আবার অনেক সময় চলন শক্তির মত এই সব নানা দৃশ্য ছায়াছবির মত একটির পর একটি যেন এক এক স্তর ভেদ করিয়া পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সমুদয় দৃশ্যও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার অনুযায়ী প্রত্যেকের বিভিন্ন, আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের ধারাও ভিন্ন ত। যেমন প্রত্যেক লোকের চেহারা, মনের গতি ও স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। সাধন রাজ্যে সাধনার ধারাও প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের বিভিন্নতা রহিয়াছে। উপরোক্ত মূর্তি দর্শনে ঐসব অনেক সময় সাধককে সাধনায় সাহায্য করে। স্থূল, সূক্ষ্মের দ্বন্দ্ব যেখানে পূর্ণ সমাধান, সেখানকার কথা আলাদা।

একদিন মাকে প্রশ্ন করা হইল ঃ— আমরা যাহাদের উন্নত সাধক বলিয়া মনে করি, জিজ্ঞাসা করিলেও তন্ন তন্ন করিয়া নিজের সাধনার অবস্থার কথা ত বলিতে পারে বলিয়া বিশেষ শোনা যায় না। কিছুটা বলে শোনা যায়। আর যাহারা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে তাহারাও কিছু কিছু মাত্র বলিতে পারে। আপনি কিভাবে আমাদের জিজ্ঞাসায় এতটা বলেন ?

উত্তরে মা বলিলেন — তবে শোন একটু। যখন সাধক সাধনা করে তখন এই সব আবার কাহাকেও বলিতে হইবে এ ভাব ত থাকিতে পারে না। আর থাকিলে ত প্রকৃত সাধনা বলা চলে না। কারণ ইহাও ত আর একটা বাসনার সৃষ্টি। শুধু বাসনার সৃষ্টিই নয়, অগ্রসর হইবার পথে যে বিশেষ বিঘ্ন। আগাইয়া যাইতে পারিবে কি ? কারণ যে যে লাইনে চলুক না কেন, বাসনা নির্মূলের দিকে উদ্দাম গতিতে চলা ত — শুধু তাঁহার দিক নিয়া মাতিয়া থাকা। আর যতটা স্থিতি, সেই অনুসারে প্রকাশ কিন্তু জানিও। আর যেখানে সবই সম্ভব সেইখানে এই প্রশ্ন কোথায় বল ? এই শরীরটার কথা বাদ দাও, এলোমেলো যখন যা। আবার জিজ্ঞাসায় — আচ্ছা মা! এইসব তা যেন বুঝিলাম। কিন্তু আপনি যে নবজাত

শিশু বয়সের অনেক কথাগুলি বলেন, আমরা শুনিয়াছি যেখানে স্বরূপ, সেই জ্ঞান প্রকাশ, সেখানে সমগ্র বিষয়েরই জ্ঞান নাকি অখণ্ড শুনিয়াছি। আগে পরে, অজানার প্রশ্ন নাকি আর সেখানে থাকে না, সাধনার ক্রমোন্নতিতে নিরাবরণ স্বয়ং প্রকাশ যেখানে। আপনার কথাগুলি আমরা কিভাবে নিতে পারি ?

মা হাসিয়া বলিলেন — কথা এই, এই শরীর তোমাদের দৃষ্টিতে নবজাত শিশু বয়সেও যা, এখনও তাই ত। সাধনার ক্রমোন্নতিতেই এই কি ? ইহাই কি তোমাদের বিশ্বাস ? তোমরাই বিচার কর না। তোমরা যে যা বল তাই। এ শরীরের ত সব সময় সব কথা বলিবার খেয়াল হয় না। এখন তোমরা যা বোঝ।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গে মা বলিতে লাগিলেন — পরদিন প্রাতে নিয়মিত ক্রিয়াদির পর চুপ করিয়া বসিয়া আছি দেখি হাতের আঙ্গুলাদির নানা-রূপ ক্রিয়া আরম্ভ হইল। পরে পায়ের আঙ্গুলাদিরও এইরূপ হইল। ইহাতে অনেক সময় লাগিল। আবার হাতের প্রায় কবজিখানি ভ্রূযুগলে রাখিলে প্রায় ভ্রূযুগলের দিক দিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি যাইয়া সেই ত্রাটকে হাতের কবজির নিম্ন অংশখানা সরু হইতে হইতে আছে কি নাই এই জাতীয় অনেক রকম যোগের ক্রিয়াদির প্রকাশ হইল। আসন যেমন হাতের সাহায্য ব্যতিরেকে হইয়া যাইত, প্রাণ বায়ুর সংযোগে তেমনই হাতখানিও আপনা আপনি উঠিয়া ঐ ক্রিয়াদির সাহায্য করিল। নিজের অঙ্গের মধ্যে আরও কত রকম নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি হইয়া অনেক জাতীয় ক্রিয়াদি হইত। তারপর হাতের গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে আঙ্গুলাদি পর্যন্ত নানা ভাবে ক্রিয়া হইল। আর এই শরীর পলক শূন্য অবস্থায় এক দৃষ্টিতে সব দেখিতে লাগিল। রাত্রে এই সব ক্রিয়া বিবিধরূপে হইল।

পরদিন প্রাতে যখন বসিলাম তখনও এই জাতীয়ই হইল। মধ্যাহ্নে বসিলে দেখিলাম উপরোক্ত ক্রিয়াদির পর যে কোন মূর্তি ভাবে ভাসিয়া উঠে, অন্য দিকে চাহিলেই তাহার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়। এইরূপে দেখি, যে কোন জিনিষ চোখে আসে তাহারই একটা সাদা জ্যোতিঃ পূর্ণ মূর্তি যেদিকে তাকান হয় সেই দিকেই দেখা যায়, আবার দেওয়াল ইত্যাদি সব জায়গায় এইরূপ সবই যে জ্যোতির্ময় চিন্ময় এ খেলার অনেক রকমারিটা হইবার পর শ্বাসের গতিতে উঠিয়া দাঁড়ান হইল। পরে সেই অবস্থায় সামনের দিকে দুই হাত দিয়া

মাটি স্পর্শ করা হইল। যেন হামাগুড়ির মত। ইহার মধ্যে দেখা গেল শ্বাস প্রশ্বাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে তলপেটের নাড়িভুঁড়িগুলি নড়াচড়া করিয়া উর্দ্ধ মুখে উঠিয়াছে এবং খেয়াল হইতেছে নাক, মুখ, কান, চোখ, বাহ্য প্রস্রাবের দ্বারগুলি দিয়া পর্যন্ত সরল ভাবে শ্বাস এবং বাতাস চলাচল করিতেছে। যেন একটি খোলা আঁকা-বাঁকা পাইপের ভিতর দিয়া বাতাস আসিতেছে ও যাইতেছে। অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া শরীর স্থির হইয়া গেল। তখনও সূর্য্য ডোবে নাই। বাহিরে যাইতেই একবার পূর্বমুখী আবার সূর্যমুখী হইয়া হাতে সূর্য্য প্রণামের ক্রিয়াদি হইল। প্রথমে চোখ বুজা ছিল, শেষে খুলিয়া গেল। পরে দেখি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া এক এক বার চোখ বুজি আর এক এক বার মেলি। দেখা গেল নানা আভাযুক্ত একটা তেজোময় বস্তু সর্বদিক জুড়িয়া আছে। কতক্ষণ এইরূপ দেখিবার পর সে স্থান হইতে সরিয়া যাওয়া হইল।

সব সময় লক্ষ্য করা হইত একস্থানে কোন ক্রিয়া আরম্ভ হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তথা হইতে উঠিবার বা সরিবার একটু খেয়াল আসিলেও তাহা হইত না। তখন এ শরীরের সাধনার খেলা চলিতেছিল কিনা। ইহাই মহাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়ার নিদর্শন। মহাশক্তির লীলা হইল স্থিরত্ব ও অপ্রতিহত প্রকাশ এবং অখণ্ড ক্রিয়ার গতি। আর ইচ্ছাশক্তির স্বভাব হইল কাজে বুদ্ধিযুক্ত ইচ্ছার প্রয়োগ করা। যেমন আগুন ছাড়া ধোঁয়া নাই সেইরূপ একেরই প্রকাশে ইচ্ছাশক্তি ও মহাশক্তির ক্রিয়া। মহাশক্তির স্থায়িত্ব ও ইচ্ছাশক্তির অভাবের দিক। এই সবগুলিই দীক্ষার খেলাটার পরে।

এক সময়ে স্থিরভাবে বসিয়া আছি, দেখি কি শ্বাসের ক্রিয়া হইয়া জিহ্বাটি যেন উপর দিকে উঠিতেছে, চেষ্টা সত্বেও ঠিক রাখা যাইতে পারে না। তখন দেখি জিহ্বার নীচে যে জোড়া আছে, তাহা যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। ক্রমে ক্রমে দেখিলাম জিহ্বাটি উলটিয়া তালুর সঙ্গে একেবারে লাগিয়া গেল। বিচার রূপে আসিল কি করিয়া জিহ্বা ঠিক হইবে। আর কথাবার্তাও বা কি করিয়া চলিবে? অথচ তাহার জন্য কোন প্রকার অস্থিরতা নাই। অনেকক্ষণ পরে দেখি জিহ্বা আপনা হইতে যথাস্থানে আসিল। পরে কয়েকদিন জিহ্বার নীচে ব্যথা বোধ হইয়াছিল। দীক্ষার খেলাটা আরম্ভ হইবার সামান্য কিছুদিন পূর্ব হইতে ৫/৬ মাস ধরিয়া এইরূপ নানা ভাবে ক্রিয়াদি

হইয়াছিল। কেবল বিশেষ বিশেষ কোন কোন বিষয় বলা হইল মাত্র। ইহা ছাড়া অনেক রকম হইয়াছিল।

পরে দেখিলাম আসনাদি কমিয়া গেল। স্থির হইয়া বসিলে শ্বাসের ক্রিয়া, মাটিতে শুইয়া থাকিবার ভাব, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার খেয়াল, ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ভোলানাথ দেখেন স্নান, খাওয়া, ঘুম বা বিশ্রামের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। শরীরের দিকে একেবারে লক্ষ্য নাই। রাত্রে বিছানায় একেবারে শুই না। সময় বা রাতদিনের কোন পার্থক্য নাই। কি এক ভাবের উন্মাদনায় দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে। সংসারের কাজ যেন কলের মত চলিয়া থাকে। বাহিরের সকলের সঙ্গে চলাফেরায় কর্তব্য কর্মে কোনও ত্রুটি নাই, কিন্তু সব কাজই যেন আল্‌গা আল্‌গা। সে সময়কার ভাবের সব কথাটা বলিয়া বুঝান যায় না।

বাজিতপুরে এক পণ্ডিত ছিলেন। ৭০/৮০ বছর বয়স। তাঁহাকে ভোলানাথ যাইয়া সকল অবস্থা জানাইল। তিনি বলিলেন — এ সব ত সাধারণ কথা নয়। ইহাকে অন্তর্যোগ বলে। যাহার অন্তর জাগ্রত হয় তাহার এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। ইহাতে কোনও বাধা দিবেন না। আপনভাবে তাহাকে থাকিতে দিন। মুদ্রা আসনাদি যে বহুপ্রকার হয় — ইহা ত গুরুর শিক্ষা ছাড়া অসম্ভব। আপনা আপনি এইরূপ হওয়া অত্যধিক অলৌকিক অসাধারণ ব্যাপার। ভোলানাথ বাসায় আসিয়া আমাকে সব জানাইল।

প্রথম যখন আসনাদি বিশেষভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন দেখিতাম পরনের কাপড়াদি যে কখন কোথায় সরিয়া যাইত, শরীরের পূর্ণ খেয়াল থাকা সত্বেও সেইগুলি ঠিক করিয়া দিবার ভাব জাগিত না। কলের মত শরীরটা আপনভাবে চলিত, শরীর ও কাপড়ে মাটি মাখামাখি হইত। স্নান করিয়া চুল খোলা রাখিয়া বসিতাম, দেখিতাম লম্বা চুল আসনে, হাতে পায়ে জড়াইয়া যাইত এবং কোন সময় বেকায়দায় টান পড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইত। কোন সময় মাটিতে পড়িয়া ধূসরিত হইত। কিন্তু তাহার প্রতিকার করিবার ভাবও আসিত না। মাঝে মাঝে শরীরে কোনও জায়গায় ব্যথাও পাইতাম, কিন্তু শরীরের কোনও দিকে খেয়াল যাইত না, কেবল দেখিয়া যাইতাম। মাঝে মাঝে কাপড়াদিও ছিঁড়িয়া যাইত। শরীরের কোনখানে কাপড়ের ও চুলের টানে সামান্য আঘাত দেখা দিত। কিন্তু সব দেখিয়া যাওয়া

হইত। শরীরের কোনও কর্মে বিশেষ লক্ষ্য পড়িত না যে ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়া লই। কয়েকদিন পরে মাথার চুলগুলি স্নানের পর বাঁধিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলাম। স্নানের সময় চুল খুলিয়া ডুব দিয়া স্নান করা হইত। সে ভিজা চুল বাঁধাই থাকিত। কয়েকমাস যাইতেই দেখা গেল যতখানি চুল বাঁধাই থাকিত ততখানি পচিয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে। চুলের গোড়া সর্বদা ভিজা থাকিতে থাকিতে পিছনে ঘাড়ের কাছে অনেকটা ছড়াইয়া ঘায়ের মত হইয়া গেল। জ্বালা বোধ করিবার অবসরও নাই, খেয়ালও নাই।

শুইবার খেয়াল যখন বাড়িয়া উঠিল তখন দেখা যাইত শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে কি এক ভাবের পরিবর্তনের গতিতে সর্বশরীর কি একটা স্থিরভাবে মাটিতে আপনা আপনি পড়িয়া থাকিত। সে কথাও যে কেমন বলা আসিতেছে না, বসিয়াও কখনও তাহা হইত — অটল, অচল। আবার ইহার মধ্যে কোনখানে বড় শব্দ হইলে ছোট শিশুর মত চমকিয়া উঠিত। তন্মুহূর্তে যেন শিশুর ভাব আসিয়া যাইত এবং হাসিকান্না, চলাফেরা ইত্যাদির দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইত। কয়েকদিন পর দেখা গেল কেহ কাহাকেও মারিলে, এমন কি মাটিতে আঘাত করিলেও এই শরীরে আঘাত লাগিত। কোনও জলভরা বাসনে হঠাৎ ধাক্কা লাগিলে যেমন জলটা ঢেউ খেলিয়া কাঁপিয়া উঠে, আবার স্থির হয়, ঠিক সেই রকম এই শরীরটার খেলা হইতে লাগিল। এ শরীরটা সব কিছু নিয়াই যেন একই সত্ত্বা, আলাদা কিছু নাই — এই এক পূর্ণভাব দিবারাত্রি চলিতে লাগিল। দেখিতাম প্রয়োজনীয়তার সাথে সাথে এ শরীরের গতি আপনা হইতে পরিবর্তিত হইয়া যাইত। সাংসারিক কর্মের জন্য উঠিয়া যাওয়া হইত আবার তাহা শেষ হইয়া গেলেই কলের মত আসিয়া বসিয়া পড়া হইত। কিন্তু বাহির ভিতর একই ভাব।

দিনে দিনে প্রকাশ হইতে লাগিল যে ভ্রূমধ্যে একটি স্পর্শানুভূতি ও সর্ব শরীরেই রাতদিন একইভাবে অস্বাভাবিক একটা ক্রিয়ার গতি চলিতেছে। আনন্দে ঢুলু ঢুলু অবস্থা, বাহিরে ভিতরে সর্বক্ষণ প্রকাশ থাকিত। একদিন রাত্রিতে এই শরীর চুপ করিয়া বসিয়া আছে, দেখি কি, এ শরীরের মাথা হইতে পা পর্যন্ত হাতের আঙ্গুলগুলি ফিরাইয়া ফিরাইয়া ভ্রূমধ্যে একটি চোখ ও এ শরীরের মধ্যেই পূর্ণ একটি মূর্তি তৈয়ারী করা হইল। সব ত বলাও হয় না, আসেও না।

কি সুন্দর রকমারিটা হইতেছিল। প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল যে দিব্য ভাব, দিব্য মূর্তি — স্থির ধীর গম্ভীর, কি ভাব, ভাষায় বলা যায় না। ভগবৎ দিকের ক্রিয়ার — প্রকাশের দিকটা কিনা, কাজেই কিরূপ ভাবটা যে প্রকাশ হয়, তাহাই বলা হইতেছে। আবার এক সময় পরে এইরূপ হইল যে প্রাকৃত, অপ্রাকৃত যাহা কিছু রূপ কিংবা অরূপ, এই যে প্রকাশটা — অবতার, সাধু, মহাত্মা, দেবতা, মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া গাছপালা জীবজন্তু ইত্যাদি দৃশ্য বা অদৃশ্য, ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সবই এক সত্ত্বা। সাধক যখন সাধনায় অগ্রসর হইতে হইতে বিরাট রূপ ও এক সত্ত্বার আভাস পাইতে থাকে, পরে তাহার এইরূপ সর্বময় দিব্যরূপ অরূপে মহাপ্রকাশ। এই শরীরেই এই খেলাটা। রাত্রি শেষ হইয়া গেল।

পূজা পাঠ জপ বিষয়ে মা

আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিলেন — দীক্ষিত হউক বা না হউক যাহার যে ধর্ম সেই অনুসারে জপ পাঠ, ভজন কীর্তন, প্রার্থনা ইত্যাদি যাহার যাহা, একটা কিছু প্রত্যহ নিয়মিত রূপে কিছু সময়ের জন্য বহির্জগত ভুলিয়া একান্তে নির্জনে করিবার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক এইরূপ সর্বদা করিতে করিতে শাস্ত্র বিহিত কর্মাদির উপর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আসে। কেননা সঙ্গগুণের ক্রিয়া স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। জপ, ক্রিয়া ইত্যাদি যে যাহা করে ঠিকমত চলিলে আপনা হইতে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া ও আসনাদি যাহার যাহার সংস্কার অনুযায়ী যেইরূপ প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন সেইরূপ হইয়া যায়। ইহা ধ্রুব সত্য। ইহাতে দেহের জড়তা নষ্ট হয় ও লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে নাম, মন্ত্র বা ক্রিয়া ইত্যাদির উপর যতই প্রীতি জন্মে ততই ভাবের একাগ্রতা বাড়ে। প্রীতিই, স্মৃতি ও আকর্ষণের মূল। যে জাতীয় ক্রিয়া করা হয় সেই সেই অধিপতি কৃপারূপে প্রকাশ হয় বিশ্বাস রাখা।

জপের সম্বন্ধে রকমারি করিয়া আরও শুন্‌বি ত শোন্‌ তবে। হৃদয়ে ও কণ্ঠে লক্ষ্য রাখিয়া যখন জপ করা হয়, তখন ক্রিয়াজ্ঞান থাকে বলিয়া চিন্তার ধারা চেষ্টা করিয়া রাখিতে হয়। জপ করা ও জপ হওয়া, দুইটি একেবারে পৃথক জিনিষ।

শরীরে ও মনে ভাব-বিশুদ্ধতা না আসিলে ক্রিয়া ও মন্ত্রজপ হওয়া হয় না।

হৃদয়ে জপ যখন আপনা আপনি হয় তখন জপ করিবার খেয়াল থাক বা না থাক প্রবলভাবে জপ উঠিতে থাকে এবং জাগতিক সকল ভাব ভুলাইয়া জপের দিকে স্রোতের মত টানিয়া আনিতে থাকে। শরীরে মন্ত্র ও ক্রিয়াদির ভাববিশুদ্ধতার চরমতা ধারণ না করিলে কণ্ঠের জপ হওয়া হয় না। তখন কণ্ঠের আল্‌জিহ্বা অবিরাম ঘড়ির পেণ্ডুলাম কিংবা পাম্প করার ন্যায় আপন কাজ করিতে থাকে, জপভাব অথবা শরীরের ক্রিয়াদিতে খেয়াল থাক বা না থাক। ইহাকে অজপা জপ বলা যাইতে পারে। ইহাকে বলে কণ্ঠজপ হইয়া যাওয়া। সাধারণতঃ কণ্ঠে জপ স্থিতি না হওয়ার কারণ জাগতিক ভাব যুক্ত স্থিতিতে স্থিতি থাকে বলিয়া কিন্তু। ক্রিয়া ইত্যাদির যখন পূর্ণাহুতি হয় তখন রূপ, গুণ, বীজ ইত্যাদির গণ্ডি ছাড়াইয়া এক বিরাট মহান ভাব স্বরূপে যাইতে থাকে। যখন ক্রমশঃ উপাসকের শক্তি লাভ হয় এবং একমুখী অখণ্ড ভাবের ধারা উদয় হইতে থাকে, পাছে তাহা হারাইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কায় তাহাকে সর্বদা আকুল করিয়া দৃঢ়ব্রতী করিয়া রাখে। এইরূপ আসক্তি উদয় হইলে তাহার দেহের ভাবগ্রন্থিগুলিও ক্রমশঃ খুলিতে থাকে। সে দেখিতে পায় যেমন কোন বিষয়ে হাসি পাইলে নানা বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও ভিতর হইতে হাসি আসিয়া মুখ খুলিয়া যায় সেই ভাবে অন্তরের অন্তরতম স্থল হইতে যাহার যে সংস্কারজনিত মন্ত্র ক্রিয়াদি আপনা হইতেই বিনা চেষ্টায় বাহির হইতে থাকে। তোমাদের মন্ত্র-চৈতন্য বলিয়া যাহা কথিত আছে না, সেই জাতীয়। শরীরের ভিতর শিশুদের বাক্যের কেন্দ্রস্থল এবং শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদির আদিস্থান এক বলিয়া — মূলে ত একই, তাহাদের কথা বাহির হইবার পূর্বে এক অক্ষর বার বার বলিতে বলিতে হঠাৎ একটা শব্দ যোজনা হইয়া বাহির হয়, সাধকের মুখ দিয়া মন্ত্র ইত্যাদিও সেই ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। সে অবস্থায় ধরিয়া নিবে যে মন্ত্রের সহিত উপাসকের পরিচয় হইল।

ছেলেরা প্রথম পড়ে আবার যখন লিখিতে আরম্ভ করে তাহা পূর্বের পড়ার সঙ্গে মিলায়, অর্থ বুঝিতে চায়। সেইরূপ মন্ত্র যখন তাহার আপন স্বভাবে খুলিয়া যায়, তখন মুখে আওড়ান ভাবটার সঙ্গে সঙ্গে — এ শব্দটি কি? ইহার মূল কোথায়? ইহার অর্থ কি?

তাহা জানিবার ঔৎসুক্য জাগে — ঐ দিকের জিজ্ঞাসু যেমন। সেই সময়ে সাধকের বহির্জগতের খেয়াল কমিয়া যায়। এইরূপে যতই অন্তর্জগতের কপাট খুলিয়া যায় ততই সে রূপ, গুণ, অর্থাদি সহ যার যাহা ধ্যেয় সেই দেবতা ও মন্ত্রের সন্ধান অর্থাৎ সেই তত্ত্ব পায়। ইহাকে মন্ত্র-প্রত্যক্ষ তত্ত্ব-প্রত্যক্ষ দর্শনের দিক বলে।

আরবদেশীয় মহাপুরুষ

একদিন দ্বিপ্রহরে মাটিতে এ শরীরটা যেমন ঢলিয়া পড়ে তেমন পড়িয়াছিল। দেখা গেল একটি মন্দিরের নিকট বাহিরে একটি সাধু, মুসলমান ফকিরের বেশে দাঁড়াইয়া এ শরীরের দিকে চাহিয়া আছে। ইহা দেখিতে দেখিতে উঠিয়া বসা হইল। ভিতরে জিজ্ঞাসা আসিল — ইনি কে? সাথে সাথে উত্তর — আরব দেশীয় এক মহাপুরুষ। দেখিয়াও — সে কে, প্রকাশ। সন্ধ্যায় ভোলানাথকে বলা হইল — আজ আরব দেশের এক সাধু দেখা হইয়াছে। ভোলানাথ বলিয়া উঠিল — আরব দেশের মহাপুরুষ দেখিলে? আমরা হিন্দু, তুমি যে এইসব কি দেখ বুঝি না। ও ত মুসলমানের। ইহা বলিতে বলিতে একটু যেন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিল।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না

দীর্ঘ সময় নিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া যখন হইত, ক্রমে ক্রমে কমিতে কমিতে দিন রাত্রিতে শ্বাসের ক্রিয়া মাত্র দুই তিনবার এবং আসনও অদল বদল হইয়া মাত্র ২/৩-টি হয়। সেই সঙ্গে শ্বাসের গতিও দুই তিনবার, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াও বহু কমিয়া গিয়াছিল। বাকি সময় পড়িয়া থাকা বা একই ভাবে বসিয়া থাকা এই অবস্থায় কাটে। সর্বময় একই সত্তা, সর্বদা এই ভাবের আনন্দেই ভিতর বাহির একযোগে ভরপুর।

একদিন শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দেখিতে দেখিতে খেয়ালে আসিল ও জিজ্ঞাসা আসিল — এই সব কি? ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার গতি। ভোলানাথকে বলিলে তিনি বলিলেন — এই সব নাড়ীর নাম। এই রকম কত রকম ভাবাদি হইতে লাগিল

ও মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমিই দেখি, আমিই বলি, আমিই শুনি আর চুপ করিয়া থাকি। শোনার ভিতরে এক হইল — নিজের ভিতর হইতে পরিষ্কার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে, শোনা হইতেছে, আর মীমাংসা হইতেছে। একদিন আবার কোনও সময়ে ইহাও হইয়াছিল — বিছানা হইতে শরীরটা গড়াইয়া উঠিয়াছে, আর বেশ স্পষ্ট শুনা যাইতেছে — পরশু এই এই ঘটিবে। ইহা, এই ধারাটা ভিতর হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া মুখে বলিয়া শোনা — এ নয়। আচ্ছা যোগাযোগ হইলে ঘটিয়া যাইবে। দেখা গেল কেমন অস্বাভাবিক ভাবে যোগাযোগ হইল — ঘটিয়াও গেল।

এই যে আলাদা শোনা ও সময় — এইটি সুমীমাংসায় পরিষ্কার ভাবে দ্বন্দ্ব রহিত হইয়া প্রকাশ। কি রকম ? — অভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া যোগীদের, সাধকের যখন ক্রিয়ার প্রতিরূপ আলাদা প্রকাশই মাত্র তো। কে, কি ? — প্রশ্ন আর থাকে না।

মহাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি

একদিন খেয়ালে আসিল এইরকম কেন হয় ? মুখে উত্তর হইল — মহাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, এই দুইয়ের খেলা।

সাধারণতঃ জীবের ভিতর দুইটি শক্তির খেলা হয়, ইচ্ছাশক্তি ও মহাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি স্বকীয় বাসনাকে লইয়া খেলিয়া থাকে, আর মহাশক্তি সকল সংকল্প বিকল্পের উপর দাঁড়াইয়া জীবের কর্ম-ভাবানুযায়ী তাহাকে চালিত করে। সাধন জগতে যখন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ক্রিয়াদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া মহাশক্তির আভাস পাওয়া যায়, তখন এক তত্ত্বের ভিতর এই যে জাগতিক নানাত্ব তাহা ডুবিতে থাকে। তখন এক চিন্তা, একলক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। মহাশক্তির সিদ্ধান্ত না থাকিলে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পূর্ণ মীমাংসা হয় না। যেমন আগুন না থাকিলে ধোঁয়া দেখা যায় না। মুখ দিয়া বাহির হইবার সাথে সাথে সব প্রত্যক্ষ প্রকাশ হইত। মুখে উত্তর বাহির হইবার সময় ধীরে ধীরে এক একটি শব্দ বাহির হইত। কোন সময় পরিষ্কার, কোন সময় জড়ান। যেমন চারটি ধ্বনির জড়ানো ভাবে 'প্রণব' উচ্চারিত হয়। এ জাগতিক জড়ান বুঝিও না। কোনও সময় তাড়াতাড়ি বাহির হইত, কোনও সময় দেরী

লাগিত। কি বাহির হইবে, পূর্ব মুহূর্তেও তাহার কোনও প্রকাশ, ইঙ্গিত থাকিত না। বিচারের ভাবও আসিত না। কাহাকে বলা বা কাহারও নিকট হইতে কিছু জানা এই খেয়াল একেবারেই হইত না। কোনও সময়েই এ শরীরের এ দিকটাই না। আসেও না, হয়ও না। খুব কদাচিৎ ২/১-টি কথা, ভোলানাথ কাছে থাকিলে বলা হইত। নিজের খেয়াল হইত, যা কিছু দেখা, শোনা বা বলা এ সবই 'আমি'। এ 'আমি' নয় কিন্তু। জ্বালা গলা 'আমি' নয় — যা বিবেক বৈরাগ্যে জ্বালাইয়া দেয়, ভক্তিতে গলাইয়া দেয়। কখনও শরীরের ভাবে খেয়াল হইত — ইহাও আমি, উহাও আমি ! কিন্তু বাহিরের ভাষায় 'তিনি' প্রকাশ থাকিত। অর্থাৎ একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই একথা মুখ দিয়া ফুটিত, বলিবার খেয়াল হইত। আর আপনভাবে 'আমি ছাড়া কিছুই নাই' এই ভাবটা বদ্ধমূল থাকিত। এই যে আমি আর তুমি, বাহির আর ভিতর — সেটা এ শরীরের কাছে নির্দ্বন্দ্ব — এক হইয়া প্রকাশ। আমি আর তুমি যে একই — ঐ স্থিতি। একটা সময় পূর্বে আসিয়াছিল — ইহাও আমি, উহাও আমি, আবার ইহাও তুমি, উহাও তুমি। তুমি মানে তিনি, পরে আর এ আলাদা ভাব রহিল না। এ ভাবে প্রায় ২/৩ মাস চলিয়া গেল। পরে 'তিনিই আমি, আমিই তিনি' সেই একই প্রকাশ আসিল।

প্রণামে প্রতিক্রিয়া

এই সময়ে যখন কেহ এ শরীরকে নমস্কার করিতে আসিত তখন আপনা হইতেই পা সরিয়া যাইত। আলগা ভাবে কেহ নমস্কার করিলেও শরীরের ডানহাত ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া পড়িত (বরাভয় দানের মত) ও মুখ দিয়া স্পষ্টরূপে আশীর্বাদের মত শব্দটি আপনা হইতে বাহির হইত।

বাজিতপুরে নবাব স্টেটের এক কর্মচারী এ শরীরকে মা বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তাহার সহিত এ শরীরের কথাবার্তা হইত না। সে আমাদের বাসায় আসা যাওয়া করিত ও ভোলানাথের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাহার স্ত্রীর সন্তানাদি না হওয়াতে তাহার পিতা তাহাকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে বলে। তাহার একদিন কেমন এক খেয়াল হইল যে এই শরীর যখন ক্রিয়ায় বসে,

সে পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিবে। কিন্তু তখন এ শরীর ছুঁইয়া কেহ নমস্কার করিত না। কিন্তু ভোলানাথের নিকট তাহার অত্যন্ত কাকুতি মিনতিতে ভোলানাথ স্বীকার হইয়া এ শরীরকে বলাতে বলা হইল — তোমার যখন ইচ্ছা, তাহার যদি একান্ত আগ্রহ হয় তবে তাহাই হইবে। একদিন এ শরীর ক্রিয়া শেষ করিয়া উঠিতেই সে আসিয়া পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে কাঁপিতে কাঁপিতে ঢলিয়া পড়িল। ভোলানাথ 'এ কি হইল' 'এ কি হইল' বলিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং প্রতিকার করিবার জন্য এ শরীরকে বার বার বলিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সে প্রকৃতিস্থ হইল। তখনও তাহার শরীরে একটা কাঁপুনি ছিল। সে বলিল যখন পড়িয়া রহিয়াছিল সে খুব আনন্দে বিভোর ছিল এবং তাহার দরুণ সে যাহা মনে মনে প্রার্থনা করিবে ভাবিয়াছিল তাহা কিছুই বলিতে পারে নাই। ভোলানাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে বলিল যে তাহার যেন দ্বিতীয়বার বিবাহ না হয় ও তাহার একটি সু-সন্তান হয় — ইহাই তাহার প্রার্থনা ছিল। কিছুদিন পরে জানা গেল তাহার একটি পুত্র-সন্তান হইয়াছে।

ক্ষেত্রপালের ওঝাগিরি

ভোলানাথ আমার এইরূপ অবস্থাদি দেখিয়া ক্ষেত্রপাল নামক একজনকে আনিয়া বলিল যে — তুমি দেখ ত, তাহার এ সব কি হইতেছে? সে ওঝাগিরি জানিত। একদিন রাত্রে সবজান্তার মত ধূপদীপ জ্বালাইয়া ভোলানাথ আর আমি যে ঘরে থাকিতাম সে ঘরে পূজার আয়োজন করিল। আমি আমার ভাবে ঘরের ভিতর এক কোনায় বসিয়া আছি আর ভোলানাথ অপরদিকে আছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিয়া গেলে ক্ষেত্রপাল পূজা হইতে উঠিয়া ভোলানাথকে বলিল — কৈ, কিছু ত বুঝি না। এ বলিয়া তামাক সাজিল। পরে বাহিরে গেল। বাহির হইতে আসিয়া ভোলানাথের হাতে হুঁকা দিতে গেল। এমন সময় সে কাঁপিতে কাঁপিতে উপুড় হইয়া যেমন নমস্কার করে সে ভাবে মাটিতে অবশ হইয়া 'মা' 'মা' শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ মাটিতে পড়িয়া থাকায় ভোলানাথ ব্যস্ত হইয়া আমাকে বলিতে লাগিল — এ কি হইল? শীঘ্র ইহাকে ভাল কর।

আমি বসিয়া হাসিতেছিলাম। ভোলানাথ ইহা দেখিয়া তীব্রভাবে বলিতে লাগিল — তাড়াতাড়ি ইহাকে প্রকৃতিস্থ কর। পরে আমি যেস্থানে বসিয়াছিলাম সেখানে আমার মুখ হইতে কয়েকটি শব্দের মত কি বাহির হইল। ক্ষেত্রপাল উঠিয়া বসিল। খানিক পরে বলিল — আমি যখন পূজা শেষ করিয়া বাহিরে গিয়াছিলাম তখন হইতেই আমার শরীরের অবস্থা কেমন পরিবর্তন হইয়াছিল। ভিতরে আসিবার পর কি হইয়াছে আমি আর কিছু জানি না। এখানে আমার 'ওঝাগিরি' খাটিবে না। সে চলিয়া গেলে ভোলানাথ ও মামাতো ভাই তাহার এই দশা দেখিয়া খুব হাসিয়াছিল।

কয়েকটি ঘটনা

ইহার কিছুদিন পরে ঊষাদিদির মেয়ের জ্বর হয়। দুপুর বেলা আমি যখন ক্রিয়াতে বসিয়াছি, ঊষাদি মেয়েটিকে কোলে করিয়া সেখানে আসিল এবং বলিল — দেখ দিদি! ওর কেমন জ্বর হইয়াছে। মেয়েটিকে আমার কাছে নিলাম এবং সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিলাম ও বলিলাম যে ইচ্ছা হইলে আজ হইতে তিন দিন প্রত্যহ এ সময়ে যেন তাহাকে এ শরীরের কাছে নিয়া আসে, সেই দিন হইতেই তাহার জ্বর একটু একটু কমিতে লাগিল। পরদিন যখন মেয়েটিকে এ শরীরের নিকট আনিতে চায়, তখন তাহার স্বামী বলিল — এ সব আমি পছন্দ করি না। মেয়েকে আমি দিব না। ঊষাদি বড় দুঃখিত হইয়া এ শরীরকে জানাইল। কিছু বলা আসিল না। তারপর মেয়ের জ্বর বাড়িল। ২/৩ দিন পর্যন্ত জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। ঊষাদি আসিয়া অতি বিনীত হইয়া বলিল — দিদি! আমার ত কোন অপরাধ নাই। তুমি কৃপাদৃষ্টি করিয়া শিশুটিকে ভাল কর। এ শরীর চুপ করিয়া রহিল। পরে শুনিলাম, ক্রমশঃ মেয়েটি ভাল হইতে লাগিল।

ভোলানাথের ভাই-ভগিনীদের ভিতর চিঠিপত্র, দেখাশুনা বা খবরা-খবরের বিশেষ চলাচল ছিল না। তাই এ শরীর সকলের সহিত চিঠিপত্র লিখিয়া তাহাদের ভিতর মেলামেশা রাখিয়া দিত। কিন্তু যখন হইতে শরীরের অবস্থাগুলি আরম্ভ হইল তখন চিঠি লেখা, চিঠি পড়ানো বা অনুসন্ধান নেওয়ার ভাব বা অবসর একেবারেই

হইত না। কাহারও খবরাদি নিবার কথাও খেয়ালে আসিত না। ইতিমধ্যে ভোলানাথের ছোট ভাই যামিনী পত্রের দ্বারা জানাইল যে কোনও এক মোকদ্দমায় তাহার জেল হইবার আশঙ্কা আছে। যেই-দিন মোকদ্দমার তারিখ সেইদিন ভোলানাথ এ শরীরের সন্ধ্যার আসনের নিকট গিয়া বলিল — তুমি যা বল সবই ত ঠিক হয়। বল দেখি, যামিনী এখন কোথায়? বলিলাম — সে এখন বন্ধ আছে। ভোলানাথ খুব ব্যতিব্যস্ত হইল। কিছু দিন পরে যামিনী লিখিল — মোকদ্দমা মিটমাট হইয়াছে। তখন ভোলানাথ বলিল — তোমার এইসব কি? দেখ দেখি, যামিনী ত বন্ধ নাই। শেষে যামিনী বাজিতপুরে আসিলে জানা গেল যেইদিন এ শরীর ঐ কথা বলিয়াছিল, সেই সময় বাস্তবিকই সে হাজতে ছিল।

একদিন খবর আসিল যে ভোলানাথের বড় ভগ্নীপতি সীতানাথ কুশারী মহাশয় তাহার নিজ বাড়ী দৌগাছিতে খুব অসুস্থ। ভোলানাথকে দেখিতে চায়। সেইদিনও ভোলানাথ আসিয়া এ শরীরকে জিজ্ঞাসা করে — বল দেখি তাহার কি অবস্থা? বলিলাম — অসুখ বেশী, তবে তুমি গিয়া দেখা করিলে সারিয়া যাইবে। ভোলানাথ দৌগাছি গেলে ক্রমে ক্রমে কুশারী মহাশয় আরোগ্যলাভ করিলেন। তাহার পর হইতে কুশারী মহাশয়ের সহিত এ শরীরের দেখা হইলে তিনি পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিতে আসিতেন। একবার তাঁহার বাড়ীতে এই শরীরকে নিয়া সম্মুখে বসাইয়া চণ্ডীপাঠ করিয়া-ছিলেন। তিনি বয়সে পিতার সামান্য বড় ছিলেন। এ শরীরের বিবাহের ঘটক ছিলেন বলিয়া গৌরববোধ করিতেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভোলানাথের দীক্ষা

কয়েকদিন হইতে ভোলানাথের শরীর বিশেষ ভাল চলিতেছে না কথা প্রসঙ্গে একদিন বলিল — তোমার ত সব কথাই ফলবতী হয়। বল দেখি — আমার একটি বাড়ী হইবে কিনা! আমারও আর চাকুরী করিতে ইচ্ছা হয় না। বলিলাম — তোমার ত বাড়ী আছে। ভোলানাথ বলিল — কোথায়? বলিলাম — গোকুল ঠাকুর যে বাড়ীতে ছিল, সে বাড়ী তোমার। সে বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে বলিলাম — সময়ে সেই বাড়ী পাইবে। নিশ্চিন্ত থাক। পরে যখন বাজিতপুর হইতে ঢাকা আসিলাম, কথায় কথায় একজন বলিল — রমনা কালীবাড়ীর নিকট যে ভগ্নমন্দির যুক্ত জায়গাটি রহিয়াছে, উহাতে শেষদিকে গোকুল ঠাকুর নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার পর হইতে বাড়ীটি এইভাবে ছাড়া পড়িয়া আছে।

দেখিতে দেখিতে অগ্রহায়ণ মাস আসিয়া পড়িল! ভোলানাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে ১৫ই অগ্রহায়ণ আমি তাহার দীক্ষার কথা বলিয়াছি — আমি দেখিব সেইদিন কি করিয়া দীক্ষা হয়। আমি ইহা পরে শুনিয়াছি। ইতিপূর্বে কয়েকদিন যাবৎ এ শরীর বসিলেই, দিনে কি রাত্রে, মাটিতে অসাড়ভাবে শরীরটা পড়িয়া থাকিত, আবার যখন স্থির হইয়া বসিত মুখে নানা স্তব স্তোত্রাদি বাহির হইত। কখনও কখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াদির দ্বারা হাতের দুইটি বুড়ো-আঙ্গুল কখনও কনিষ্ঠ আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া আসন অবস্থায় শরীরটা কতকটা শূন্যে উঠিয়া মাটি স্পর্শ না করিয়া দোলনার মত দুলিত। আবার কখনও কখনও বুঝিতাম যে একেবারে নিরালম্ব অর্থাৎ আশ্রয়শূন্য হইয়া শরীরটা শূন্যে আছে। ইহা দ্বারা জানিবে যে যোগীরা যোগবলে অনেক অদ্ভুত কার্য করিতে পারে। শ্বাসের সহিত যুক্ত রাখিয়াই মাত্র শরীরটা শূন্যে আলগা থাকা।

কোন সময় আলগা হইয়া বসিয়া কেবল পায়ের দুইটি বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া দুই হাঁটুর মধ্যখানে হাত জোড় করিয়া বসিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়া যাইত। পূর্ব হইতে এ পর্যন্ত কত